

# ইসলামের সচিত্র গাইড

লেখক  
আই.এ.ইবরাহীম

অনুবাদ  
মুহাম্মদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ  
আল- আযহার বিশ্ববিদ্যালয়  
কায়রো, মিশর।

## সম্পাদনা পরিষদ

### সাধারণ অংশ

১. ড. উইলিয়াম পিচি ( দাউদ)
২. মাইকেল থমাস ( আব্দুল হাকিম)
৩. টনি সিলভেস্টার ( আবু খলীল)
৪. ইদরিস পালমার
৫. জামাল জারাবুজো
৬. আলী- আল তামীমী

### বিজ্ঞান অংশ

১. প্রফেসর হ্যারোল্ড স্টিওয়ার্ট কুফী
২. প্রফেসর এফ. এ. স্টেট
৩. প্রফেসর মাহজুব ও. তাহা
৪. প্রফেসর আহমদ আল্লাম
৫. প্রফেসর সালমান সুলতান
৬. সহযোগী অধ্যাপক এইচ. ও. সিন্দি

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
❖ অনুবাদকের কথা	৫
❖ ভূমিকা	৮

### প্রথম অধ্যায়:

### ইসলামের সত্যতার দলীল

১. আল- কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিজা	১০
❖ কুরআন মাজীদ ও মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া	১১
❖ মহাগ্রন্থ আল- কুরআন ও পাহাড়	১৬
❖ কুরআন ও পৃথিবীর সৃষ্টি	১৯
❖ আল- কুরআন ও মানুষের মগজ	২১
❖ কুরআন ও নদী- সমুদ্র	২৩
❖ কুরআন, গভীর সমুদ্র ও আভ্যন্তরীণ উর্মিমালা	২৫
❖ কুরআন ও মেঘমালা	২৭
❖ কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিজা:বিজ্ঞানীদের মতামত	৩২
২. একটি সুরা এনে দিতে চ্যালেঞ্জ	৩৭
৩. মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে বাইবেলের ভবিষ্যতবাণী	৩৮
❖ মুসা (আঃ) এর মত নবী	৩৮
❖ ঈসরাঈলীদের ভাতৃবর্গ থেকে	৩৯
❖ এই নবীর মুখে তার বাণী	৪০
❖ কুরআনের সংঘটিত ভবিষ্যতবাণী	৪০
❖ রাসুল (সাঃ) এর কিছু মু'জিজাহ (মিরাকল)	৪১
❖ মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনাড়ম্বর জীবনযাপন	৪২
❖ ইসলামের বিস্ময়কর বিস্তৃতিলাভ	৪৭

### দ্বিতীয় অধ্যায়:

### ইসলামের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

❖ চিরন্তন জান্নাতের পথ	৪৮
------------------------	----

❖ জাহান্নাম থেকে মুক্তি	৫০
❖ আসল সৌভাগ্য ও আত্মিক শান্তি	৫১
❖ সত্যিকার তাওবা দ্বারা বিগত জীবনের গুনাহ ক্ষমা	৫২

## তৃতীয় অধ্যায়

### ইসলাম সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান

■ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস	৫৪
❖ আল্লাহর উপর ঈমান	৫৪
❖ ফেরেশতাদের উপর ঈমান	৫৬
❖ আসমানী কিতাবের উপর ঈমান	৫৭
❖ নবী-রাসুলদের উপর ঈমান	৫৭
❖ শেষ দিবসের উপর ঈমান	৫৭
❖ তাকদীরের উপর ঈমান	৫৭
■ কুরআন ব্যতীত ইসলামের অন্য কোন উৎস আছে কি?	৫৮
❖ রাসুল (সাঃ) এর কিছু হাদীস	৫৮
■ কিয়ামতের দিন সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী	৬০
■ ইসলাম গ্রহণের নিয়ম	৬৩
■ কুরআন মাজীদের আলোচ্যবিষয়	৬৪
■ মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরিচয়	৬৫
■ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় মুসলমানদের ভূমিকা	৬৬
■ ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে মুসলমানদের বিশ্বাস	৬৭
■ সন্ত্রাস সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?	৭১
■ ইসলামে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার	৭৩
■ ইসলামে নারীর অবস্থান কোথায়?	৭৬
■ ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা	৭৭
■ বৃদ্ধদের সাথে মুসলমানদের ব্যবহার	৭৭
■ ইসলামের পাঁচটি রুকন	৭৮
❖ لا إله إلا الله محمد رسول الله এর সাক্ষ্য দেয়া	৭৮
❖ নামাজ কয়েম করা	৭৯
❖ যাকাত আদায় করা (অভাবীদের সাহায্যার্থে)	৭৯
❖ রমজানের রোজা	৮০
❖ মক্কায় হজ্জ্ব করা	৮০
■ সহায়ক গ্রন্থাবলী	৮৩

## অনুবাদের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين-أما بعد-

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। এটি আল্লাহ রাসূল আলামীর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করবেন না বলে কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
(85)

অর্থাৎ, আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুকে ধর্ম তথা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে তা কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না। পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আলে ইমরান: ৮৫)

আমরা (মুসলমানরা) অনেকেই ইসলামকে না জেনে না বুঝে তাকে অন্যান্য ধর্মের মতই একটি গতানুগতিক ধর্ম বলে মনে করি। যখন কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলে যে, ইসলাম ১৪০০ বছর আগের জন্য যুগোপযোগী ছিল; এখন তা যুগোপযোগী নয়। তখন তার কথার কোন সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হই না বরং, ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে আমাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন খটকার সৃষ্টি হয়। এটা মুসলমানদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে সহজ করে দিয়েছেন। যে কেউ তার সমস্যার সমাধান একটু কষ্ট করেই ইসলামের কাছ থেকে খুজে নিতে পারে। এতে তেমন বেগ পেতে হয় না।

অনেকে মনে করেন, আজকের বিজ্ঞান কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কিন্তু, আসলে কি তাই? না, বরং, আল কুরআন থেকেই বিজ্ঞানীরা অনেক সময় তাদের গবেষণার কাজে সহায়তা নিচ্ছে। তাদের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফল কুরআন শরীফের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

আমি একদিন আমার এক বন্ধুর সাথে "কুরআন ও বিজ্ঞান" বিষয়ে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন: কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে তো মিল নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন জায়গায় মিল নেই? আপনি কোথায় অমিল দেখতে পেলেন? তিনি বললেন: বিজ্ঞান বলছে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং নামক মহা বিস্ফোরনের মাধ্যমে কিন্তু, কুরআন তো তা বলে না। আমি তাকে বললাম: ভাই! আসলে কুরআন নিয়ে পড়াশুনা না করার কারণে আমরা অনেকেই এ রকম কথা বলে ফেলি। অথচ, কুরআন শরীফেই

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সুরা আশ্বিয়ায় বলেছেন:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা (কাফিররা) কি চিন্তা করে না যে, আকাশ ও পৃথিবী একিভূত ছিল (মুখ বন্ধ ছিল) অতঃপর আমি তাদেরকে আলাদা করেছি? (সুরা আশ্বিয়া: ৩০)

এই আয়াতের সাথে তো বিগ ব্যাং এর কোন বৈপরিত্য থাকল না। তবে, যখন দেখা যাবে বিজ্ঞানের সাথে কুরআন শরীফের কোন বিষয় মিলছে না তখন বুঝতে হবে- কুরআন শরীফ যেটা বলেছে তাই সত্য; বিজ্ঞানীদের গবেষণা সঠিকভাবে হয়নি, বিজ্ঞানীদের গবেষণার আরও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, বিগত দিনে এমনই প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলাম শুধুমাত্র কুরআন বা হাদীসে উল্লিখিত বিষয়ের ভিতরেই তার পরিধি ব্যাপ্ত করে রাখেনি। বরং, সেটা যেন নিত্য নতুন ভাবে মানুষের সামনে আসতে পারে সে জন্য নতুন নতুন বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য ইসলামের রয়েছে কিছু সূত্র। নতুন নতুন বিষয় সামনে আসলে সে সূত্রগুলোর আলোকে তাকে যাচাই বাছাই করেই সিদ্ধান্ত দেবে ইসলামিক স্কলাররা। এ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা চান- তার বান্দারা নিজেদের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা ভাবনা করুক। সেজন্য ছোট খাট বিষয়কে তাদের চিন্তা-ভাবনার উপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

অনেকে প্রশ্ন করেন- ইসলামে চারটা মাজহাব হল কেন?

এর উত্তর হচ্ছে- ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে উক্ত চার মাজহাবসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য মাজহাবের প্রবক্তা ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তাদের মতবিরোধ শুধু ছোটখাট বিষয়ের উপরে। আর এটা ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ইসলামী স্কলারদের চিন্তা-ভাবনার ও মতামতের মাঝে মতবিরোধ থাকলেও তারা একে অপরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কথায় আসা যাক-

তিনি বলেছেন: যে ফিকহের (ইসলামি হুকুম আহকাম) ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চায় সে যেন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর গ্রন্থাদি পড়াশুনা করে। (আশবাছ ওয়ান নাযায়ের- ইবনে নুজাইম) এ ছাড়া তিনি বলেছেন: (ভাবার্থে) ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষেরা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মুখাপেক্ষী।

এ বইটি অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে পারব। এ বইয়ের মধ্যে কুরআনের কিছু মিরাকেল ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন

করা হয়েছে। যা মহাগ্রন্থ আল কুরআন তথা ইসলামের সত্যতারই প্রমাণ বহণ করে। সবশেষে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাকে কুরআন ও হাদীস অনুসারে জাতিকে কিছু উপহার দেয়ার তাওফিক দান করেন এই দোয়া কামনা করে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

তাং- ২৪শে জুলাই, ২০১০

দোয়া কামনায়  
মুহাম্মদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ  
আল- আযহার বিশ্ববিদ্যালয়  
কায়রো, মিশর

## ভূমিকা

"ইসলামের সচিত্র গাইড" নামক এ বইটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমতঃ ইসলামের সত্যতার পক্ষে কিছু প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে মানুষের মুখে সচরাচর প্রচলিত কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নসমূহ হল: -

- কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী এবং রাসূল ( সাঃ) এর উপর আল্লাহ তায়ালার কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ এটা ঠিক কিনা?
- মুহাম্মদ ( সাঃ) আসলেই আল্লাহ তায়ালার নবী কিনা?
- ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ধর্ম এ কথা কি আসলেই সত্য?

এ প্রশ্নগুলোর জবাবে ছয় ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন করে হয়েছে।

১. এখানে কুরআন শরীফের ভিতরকার কিছু বৈজ্ঞানিক মু' জিজা ( মিরাকল) বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিভাগে ছবিসহ এমন কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অথচ, চৌদ্দশত বছর আগেই কুরআন শরীফে তা বলা হয়েছে।

২. কুরআন শরীফের সুরার মত একটি সুরা এনে দেয়ার মত চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার কুরআন শরীফে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন কুরআন শরীফের সুরার মত একটি সুরা এনে দেয়ার। কিন্তু, কুরআন নাযিলের পর চৌদ্দশত বছর অতিক্রম করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসেনি। এমনকি কুরআন শরীফের ১০ শব্দ বিশিষ্ট ছোট্ট সুরা সুরাতুল কাউছারের মত সুরা নিয়ে আসতেও তারা এগিয়ে আসেনি।

৩. বাইবেলে বর্ণিত মুহাম্মদ ( সাঃ) এর নবুওয়্যাত সংক্রান্ত ভবিষ্যত বাণী। সেখানে রাসূল (সাঃ) এর আগমনের ভবিষ্যতবাণী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. কুরআন শরীফের কিছু আয়াতে কিছু কিছু ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে যা পরবর্তীতে বাস্তবে ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ- কুরআন শরীফে পারস্য সাম্রাজ্যের উপরে রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যতবাণী উল্লেখিত হয়েছে।

৫. মুহাম্মদ ( সাঃ) এর হাতে অনেকগুলো মু' জিজা সংঘটিত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ তা চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।



৬. রাসূল ( সাঃ) এর অনাড়ম্বর জীবন- যাপন প্রমাণ করে যে, তিনি দুনিয়ার ভোগবিলাস বা ক্ষমতার জন্য নবুওয়্যাত দাবি করেন নি।

এই সমস্ত প্রমাণাদি উপস্থাপনের পর সার সংক্ষেপে দাঁড়ায় এ রকম-

- নিশ্চয় মহাগ্রন্থ আল- কুরআন আল্লাহ তায়ালার আক্ষরিক বাণী; এটা তিনি মুহাম্মদ ( সাঃ) এর উপর নাযিল করেছেন।
- মুহাম্মদ ( সাঃ) আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী।
- ইসলাম নিশ্চিতপক্ষেই সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।

আমরা যদি কোন ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করি তাহলে, আবেগ- অনুভূতির উপর ভিত্তি করে তা করা ঠিক হবে না। বরং, বুদ্ধি খাটিয়ে ও চিন্তা গবেষণা করে তা জানার চেষ্টা করতে হবে। সেজন্যই আল্লাহ তায়ালা যখন কোন নবী প্রেরণ করেছেন তখন তাকে মু' জিজা ও দলীল প্রমাণ দিয়েই সাহায্য করেছেন যা তাকে সত্য নবী বলে প্রমাণ করতে সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামের কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে ইসলাম প্রদত্ত কিছু অধিকারকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন: -

১. চিরন্তন জান্নাতের পথ।
২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি।
৩. আসল সুখ ও আত্মিক শান্তি।
৪. সত্যিকার তাওবা দ্বারা বিগত জীবনের গুনাহ ক্ষমা করা।

তৃতীয় অধ্যায়: ইসলাম সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এখানে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল সংশোধন করার জন্য ইসলাম সংক্রান্ত কিছু বহুল প্রচলিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। যেমন: -

- সন্ত্রাস সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?
- ইসলামে নারীদের অবস্থান কোথায়?
- ইসলামে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার।
- ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা।
- মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

## প্রথম অধ্যায়

### ইসলামের সত্যতার দলীল

আল্লাহ রাসূল আলামীন তার প্রিয়তম ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনেক মু'জিজা (আশ্চর্যজনক অলৌকিক কাজ সংঘটিত হওয়া) ও দলীল প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। সে দলীল সমূহ প্রমাণ করে তিনি আল্লাহ তায়ালা'র পক্ষ থেকে সত্য নবী। তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা আসমানী কিতাব কুরআন শরীফকে বিভিন্ন মু'জিজা দ্বারা সত্য প্রমাণ করেছেন। উপরোক্ত দলীলসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালা'র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কুরআন মাজীদের প্রতিটি অক্ষরই মহান আল্লাহ তায়ালা'র বাণী; এটা প্রণয়নের পিছনে কোন সৃষ্টি জীবের হাত নেই। বক্ষমান অধ্যায়ে সে ধরণের কিছু দলীলাদি উপস্থাপিত হবে ইনশাআল্লাহ।

#### ১. আল- কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিজা

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তায়ালা'র লিখিত বাণী। আল্লাহ তায়ালা জীবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর তা অবতীর্ণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) এটাকে তার অন্তরে গেথে ও সাহাবীদের দ্বারা লিখিয়ে নিয়েছেন। সাহাবীরা এটাকে মুখস্ত করেছেন লিখেছেন এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সাথে উচ্চারণ করেছেন। শুধু এটুকুই শেষ নয় বরং, রাসূল (সাঃ) প্রতি বছর জিবরাইল (আঃ) কে একবার করে কুরআন মুখস্ত শুনাতেন। যে বছর তিনি ইস্তেকাল করেন সে বছর তাকে দুইবার কুরআন শুনিয়েছেন। কুরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রচুর সংখ্যক মুসলমান তা মুখস্ত করে এর প্রতিটি শব্দকে নিজেদের অন্তরে গেথে নিয়েছেন। এদের অনেকে মাত্র ১০ বছর বয়সেই কুরআন মুখস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। কুরআন নাযিলের পর আজ পর্যন্ত কয়েকটি শতাব্দি অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার একটি অক্ষরেও পরিবর্তন হয়নি।

চৌদ্দশত বছর আগে নাযিলকৃত কুরআন শরীফে এমন কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনা স্থান পেয়েছে যা বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এগুলোর সত্যতা প্রমাণ করেছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। এগুলো নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ তায়ালা'র লিপিবদ্ধকৃত সত্য বাণী। যা তিনি তার প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অবতীর্ণ করেছেন; এ কিতাব মুহাম্মদ (সাঃ) কিংবা অন্য কারো রচিত নয়। এটা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সাঃ) আল্লাহ তায়ালা'র সত্য নবী। চৌদ্দশত বছর আগেকার কোন মানুষ বর্তমানকালের অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলো বলে দিতে পারে এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিম্নে আপনাদের সামনে এমন কিছু বিষয়ই তুলে ধরার প্রয়াস চালাব ইনশাআল্লাহ।

## কুরআন মাজীদ ও মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া

কুরআন শরীফ মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)

অর্থাৎ, আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ থেকে। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে একটি নতুনরূপে দাড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টি কর্তা কতই না কল্যাণময়। (সূরা মু'মিনুন: ১২-১৪)

আরবী " **الْعَلَقَةَ** " (আলাকা) শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে।

১. জোক
২. সংযুক্ত জিনিস
৩. রক্তপিণ্ড

আমরা যদি জোককে গর্ভস্থ সন্তানের সাথে মেলাতে যাই তাহলে, আমরা দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাই। নিচের ১ নং ছবিতে সেটা স্পষ্ট। (মানবদেহের প্রবৃদ্ধি- মুর ও পারসাইড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৮) এ অবস্থায় জোক যেমন অন্যের রক্ত খায় তেমনি উক্ত ভ্রূন তার মায়ের রক্ত খেয়ে বেচে থাকে। (কুরআন- হাদীসের আলোকে মানব দেহের প্রবৃদ্ধি - মুর ও অন্যান্য পৃষ্ঠা- ৩৬)

দ্বিতীয় অর্থের আলোকে আমরা যদি তাকে " সংযুক্ত জিনিস " অর্থে নিই তাহলে দেখতে পাই যে, গর্ভস্থ ভ্রূন মায়ের গর্ভের সাথে লেপ্টে আছে। (২নং ও ৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

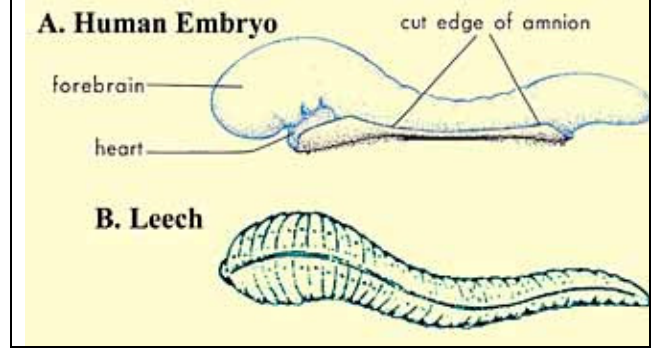
তৃতীয় অর্থের আলোকে আমরা উক্ত শব্দের "রক্তপিণ্ড" অর্থ গ্রহণ করলে দেখতে পাব যে, তার বাহ্যিক অবস্থা ও তার সংরক্ষিত খাচা (আবরণ) রক্ত পিণ্ডের মতই দেখায়। উক্ত অবস্থায় এখানে প্রচুর পরিমাণ রক্ত বর্তমান থাকে। (কুরআন- হাদীসের আলোকে মানব দেহের প্রবৃদ্ধি - মুর ও অন্যান্য পৃষ্ঠা- ৩৭ ও ৩৮) (৪র্থ চিত্র দ্রষ্টব্য)

এতদসত্ত্বেও তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এই রক্ত সঞ্চালিত হয় না। (মানবদেহের প্রবৃদ্ধি- মুর ও পারসাইড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৬৫) সুতরাং, বলা যায়- এ অবস্থা রক্তপিণ্ডের মতই।

চিত্র- ১

চিত্রে জোক ও মানব ভ্রূনকে একই রকম দেখা যাচ্ছে।

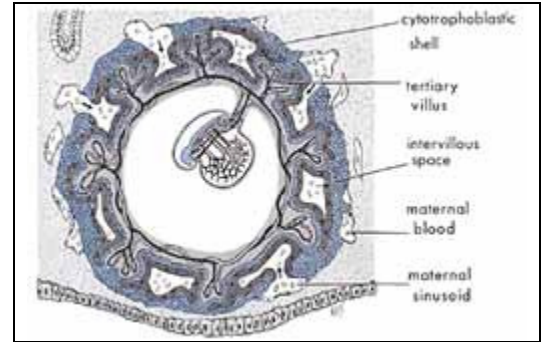
(জোকের ছবিটি কুরআন- হাদীসের আলোকে মানব দেহের প্রবৃদ্ধি - মুর ও অন্যান্য, গ্রন্থের ৩৭ নং পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে যা হিলমান ও অন্যান্যদের প্রণীত "পূর্ণাঙ্গ মৌলিক জীব" গ্রন্থের সংশোধিত রূপ এবং মানব দেহের চিত্রটি "মানবদেহের প্রবৃদ্ধি, ৫ম সংস্করণ, ৭৩ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)



চিত্র- ২

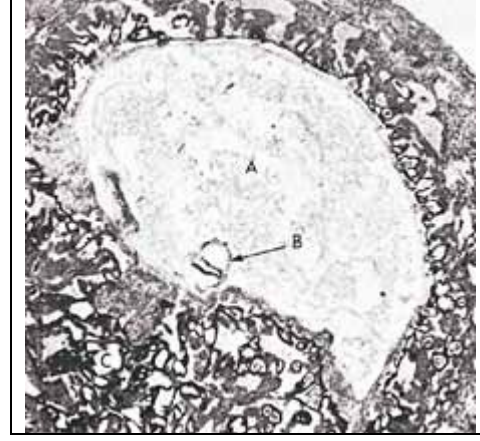
এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে উক্ত ভ্রূনটি মায়ের গর্ভের সাথে লেপ্টে রয়েছে।

(চিত্রটি "মানবদেহের প্রবৃদ্ধি, ৫ম সংস্করণ, ৬৬ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)



চিত্র- ৩

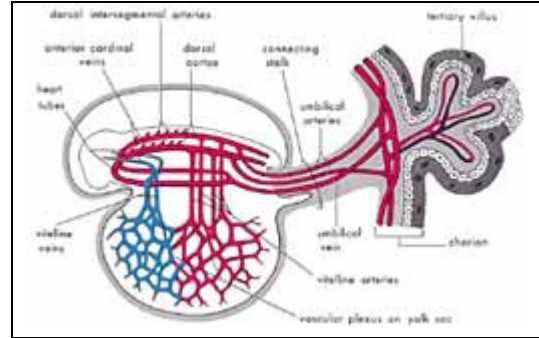
এ চিত্রে দেখা যাচ্ছে B চিহ্নিত ভ্রূনটি মাতৃগর্ভে লেপ্টে আছে। এর বয়স মাত্র ১৫ দিন। আয়তন- ০.৬ মি.মি. (চিত্রটি "মানবদেহের প্রবৃদ্ধি, ৩য় সংস্করণ, ৬৬ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে যা লেসন এন্ড লেসনের হিস্টোলজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে)



চিত্র- ৪

এই চিত্রে ভ্রূন ও তার আবরণকে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ রক্ত বর্তমান থাকার কারণে রক্ত পিণ্ডের মতই দেখাচ্ছে। (চিত্রটি "মানবদেহের প্রবৃদ্ধি, ৫ম সংস্করণ, ৬৫ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)

উক্ত "আলাকা" শব্দের তিনটি অর্থের সাথেই ভ্রূনের বিভিন্ন স্তরের গুণাবলী হুবহু মিলে যাচ্ছে।



কুরআন শরীফের আয়াতে উল্লেখিত ভ্রূনের ২য় স্তর হল- "مُضْغَةً" (মুদগাহ)। مُضْغَةً

হল চর্বিত দ্রব্য। যদি কেউ ১ টুকরা লোবান নিয়ে দাতে চর্বন করার পর তাকে ভ্রূনের সাথে তুলনা করে তাহলে, উক্ত দ্রব্যের সাথে ভ্রূনের হুবহু মিল দেখতে পাবে। (মানবদেহের প্রবৃদ্ধি, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৮) (৫ ও ৬ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

আজ বিজ্ঞানীরা মাইক্রোস্কোপসহ অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে এগুলো আবিষ্কার করেছে কুরআন নাযিল হওয়ার দেড় হাজার বছর পর। তাহলে, মুহাম্মদ( সাঃ) এর পক্ষে এত কিছু জানা কেমন করে সম্ভব যখন এ সবার কিছুই আবিষ্কৃত হয়নি?

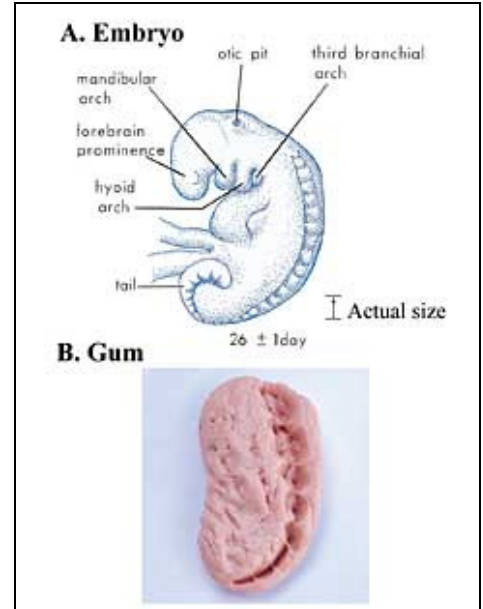
চিত্র- ৫

এই চিত্রটি ২৮ দিন বয়সের (মুদগাহ স্তরের) ভ্রূণের চিত্র। উক্ত চিত্রটি দাত দ্বারা চর্বিত লোবানের মতই দেখাচ্ছে। (চিত্রটি "মানবদেহের প্রবৃদ্ধি, ৫ম সংস্করণ, ৭২ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)



চিত্র- ৬

এখানে চর্বিত লোবান ও ভ্রূণের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাই। উপরের চিত্র A তে আমরা ভ্রূণের গায়ে দাতের মত চিহ্ন এবং চিত্র B তে চর্বিত লোবান দেখতে পাচ্ছি।



১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে হাম ও লিউয়েনহোক নামক দুই বিজ্ঞানী মাইক্রোস্কোপ দিয়ে মানুষের বীর্যের মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব (Spermatozoma) খুঁজে পান রাসুল(সাঃ) এর যুগের এক সহস্রাধিক বছর পর। এ দুইজন বিজ্ঞানীই আগে ভুলক্রমে বিশ্বাস করেছিলেন যে, মানুষের বীর্যের মধ্যে উক্ত কোষের রয়েছে অতি সামান্য প্রক্রিয়া। নারীর ডিম্বানুতে আসার পর তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। (মানবদেহের প্রবৃদ্ধি- মুর ও পারসাইড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৯)

আর প্রফেসর কেইথ এল. মুর বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ ভ্রূণ বিজ্ঞানী এবং "মানবদেহের প্রবৃদ্ধি" গ্রন্থের লেখক; তার সাড়া জাগানো এ বইটি বিশ্বের আটটি ভাষায় ছাপা হয়েছে। এটা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বই। বইটি আমেরিকার বিশিষ্ট একটি

গবেষণা বোর্ড কর্তৃক কোন একক লেখকের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কেইথ এল. মুর হচ্ছেন কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিদ্যা ও কোষ বিভাগের প্রফেসর। তিনি সেখানে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অধীনে মৌলিক বিজ্ঞান (Basic science) বিভাগের সহকারী ডীন হিসেবে এবং আট বছর শরীরবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি কানাডায় শরীরবিদ্যা বিভাগের উপর কৃতিত্বপূর্ণ স্বাক্ষর রাখার জন্য কানাডার শরীরবিদ্যা বোর্ডের পক্ষ থেকে J.C.B পুরস্কার পেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি "কানাডিয়ান এন্ড এমেরিকান এসোসিয়েশন এবং দি কাউন্সিল অফ দি ইউনিয়ন অফ বাইয়োলজিক্যাল সাইন্স" সহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থায় দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮১ সালে সউদীর দাম্মামে অনুষ্ঠিত এক মেডিক্যাল সেমিনারে তিনি বলেন: আমার জন্য এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল যে, আমি মানব শরীরের প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে ভালোভাবে জানতে কুরআন শরীফের সহায়তা নিতাম। আমার কাছে এটা এখন স্পষ্ট যে, এ বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, এ সকল বিষয়ের প্রায় সব কিছুই তার ইস্তিকালের কয়েকশত বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার সত্য নবী। ( "হাজিহী হিয়াল হাকিকাহ তথা এটাই সত্য" নামক ভিডিও ডকুমেন্টারী থেকে সংগৃহীত)

এ সময় তাকে প্রশ্ন করা হল- তাহলে কি এর অর্থ দাঁড়ায়- কুরআন মাজীদ আল্লাহ তায়ালার বাণী? তিনি জবাব দিলেন: " আমি এ কথা মেনে নিতে কুঠীবোধ করি না।"

প্রফেসর মুর একটি কনফারেন্সে বলেছিলেন: " কুরআন ও হাদীসে মানবজ্ঞানের বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সময়কার বিভিন্ন স্তরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে আলোচনা করেছে।" এ পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত চমৎকার ও বিস্তৃত অর্থ নির্দেশ করে থাকে। যা আধুনিক শরীর বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সংগতিপূর্ণ। বিগত চার বছরে সপ্তম শতাব্দীতে নাযিলকৃত কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানবজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে বিস্ময়কর ফলাফল পাওয়া গেছে। এরিস্টোটল জ্ঞান বিদ্যার জনক হওয়া সত্ত্বেও তিনি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মুরগীর ডিমের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন যে, মুরগীর বাচ্চার সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় কয়েকটি স্তরে। তবে, তিনি স্তরগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছুই জানাতে পারেন নি। ধরে নেয়া যায় যে, কুরআন নাযিলের সময় জ্ঞানের এ স্তরগুলো সম্বন্ধে খুব কমই জানা ছিল; যা সপ্তম শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কোন কিছুর উপর নির্ভর করে জানার সুযোগ ছিল না। এখানে এসে শুধু একটি মাত্র নির্ভরযোগ্য ফলাফলে আসা যায় যে, এ সমস্ত জ্ঞান মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এসেছে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। কারণ, তিনি ছিলেন নিরক্ষর তার এগুলো জানার কথা ছিল না। এছাড়া অন্য কোথাও থেকে তার মত নিরক্ষর লোককে যে ট্রেনিং দেয়া হবে তাও ছিল অসম্ভব। (ভিডিও ডকুমেন্টারী "হাজিজি হিয়াল হাকীকাত" থেকে)

## মহাগ্রন্থ আল- কুরআন ও পাহাড়

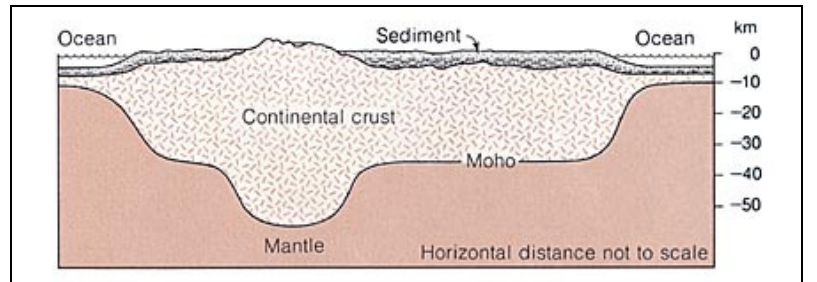
একটি বই নাম তার "পৃথিবী"। বইটি পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক রেফারেন্স হিসেবে স্বীকৃত। "প্রফেসর ফ্রাঙ্ক প্রেস" বইটির রচয়িতাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিম্মি কার্টারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা। পরবর্তীতে ১২ বছর তিনি ছিলেন ওয়াশিংটনের জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমী প্রধানের দায়িত্বে। এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- পাহাড়ের নিচে শিকড় রয়েছে। আর শিকড়গুলো মাটির অত্যন্ত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই শিকড়গুলো দেখতে অনেকটা পেরেকের মতই। (দেখুন- ৭,৮,৯ নং চিত্র)

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে পাহাড়ের কথা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন: " **أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7)** " অর্থাৎ, আমি কি জমীনকে বিছানা এবং পাহাড়কে পেরেকের মত করি নাই? (সুরা নাবা: ৬- ৭ আয়াত)

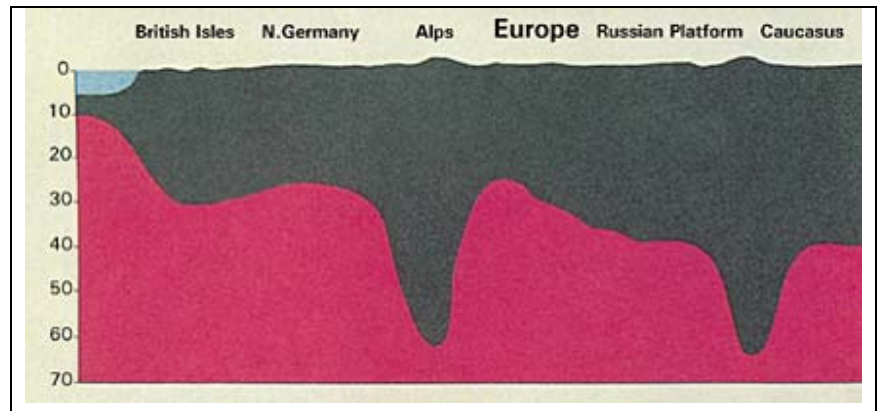
চিত্র- ৭

এখানে চিত্রে দেখা যাচ্ছে মাটির নিচে পাহাড়ের গভীর শিকড় বিদ্যমান।  
(পৃথিবী- প্রেস ও সিফার: ৪১৩ পৃষ্ঠা)



চিত্র- ৮

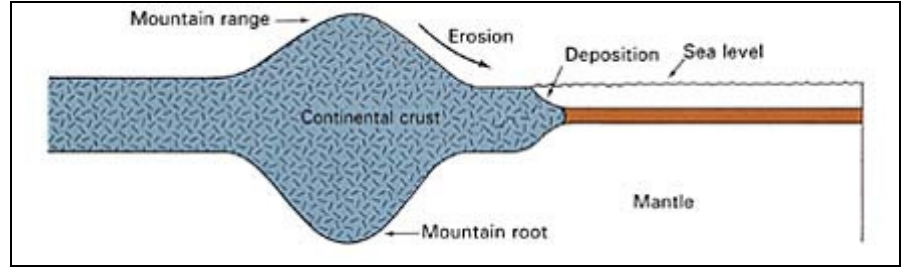
চিত্রে পাহাড়কে পেরেকের মত দেখা যাচ্ছে মাটির গভীরে যার রয়েছে প্রোথিত শিকড়। (Anatomy of the earth, ২২০ পৃষ্ঠা)





## চিত্র- ৯

মাটির ভিতর গভীর শিকড় থাকার কারণে পাহাড় কিভাবে পেরেকের মত রূপ নিয়েছে চিত্রটি তা ব্যাখ্যা করছে।  
(Earth science, Tarbuck and Lutgens)



আধুনিক ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, জমীনের নিচে পাহাড়ের রয়েছে গভীর শিকড়। (৯ নং চিত্র দেখুন) সে শিকড়গুলো সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ের যে উচ্চতা তার কয়েকগুণ পর্যন্ত হতে পারে। (কুরআন শরীফে ভূ তত্ত্ব প্রসংগ: পাহাড়- নাজ্জার, পৃষ্ঠা- ৫) তাই, পাহাড়ের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে "পেরেক" শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। কারণ, পেরেকের প্রায় সবটুকুই জমীনের ভিতর লুকিয়ে থাকে। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পাহাড়ের এ পেরেক সংক্রান্ত তথ্যগুলো ১৮৬৫ সালে জোতির্বিদ "স্যার জর্জ আইরী" র মাধ্যমে সর্বপ্রথম জানা গেছে। (পৃথিবী- প্রেস ও সিফার: ৪৩৫ পৃষ্ঠা, (কুরআন শরীফে ভূ তত্ত্ব প্রসংগ:পাহাড়- নাজ্জার, পৃষ্ঠা- ৫)

ভূ-পৃষ্ঠকে স্থির রাখার পিছনে পাহাড়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। পাহাড় ভূ-কম্পন রোধে ভূমিকা রাখে। (কুরআন শরীফে ভূ তত্ত্ব প্রসংগ:পাহাড়- নাজ্জার, পৃষ্ঠা- ৪৪- ৪৫)



আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  
(15)

অর্থাৎ, আর তিনি পৃথিবীর উপর সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যেন কখনো তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন যাতে তোমরা সঠিকপথ প্রদর্শিত হতে পার। (সূরা নাহল:১৫)

সম্প্রতি টেকটোনিক প্লেট (Tectonic plate) গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পাহাড় পৃথিবীকে স্থির রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ধারণাটা সম্প্রতি বিংশ শতাব্দীর ৬০ এর দশকে টেকটোনিক প্লেটের (Tectonic plate) উপর গবেষণার আগে জানা যায়নি। (কুরআন শরীফে ভূ তত্ত্ব প্রসংগ:পাহাড়- নাজ্জার, পৃষ্ঠা- ৫)

মুহাম্মদ ( সাঃ) এর যুগে কোন ব্যক্তির পক্ষে কি সম্ভব ছিল পাহাড়ের গঠন সম্বন্ধে জানার? কারো পক্ষে কি এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিল যে, তাদের চোখের সনুখস্থ সুদৃঢ় এ পাহাড় মাটির গভীর পর্যন্ত তার শিকড় বিস্তৃত করে রেখেছে? পাহাড়ের গভীর শিকড় রয়েছে তা আজকের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে। আজকের ভূ- তত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে, কুরআনে বর্ণিত উক্ত বিষয় সত্য।

## কুরআন ও পৃথিবীর সৃষ্টি

বর্তমান বিজ্ঞান পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৃষ্টি নিয়ে স্পষ্ট করে বলেছে যে, পৃথিবী সুদীর্ঘকাল মেঘাচ্ছন্ন ধোয়া ছিল। তা ছিল অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট এবং উষ্ণ গ্যাসের সমষ্টি। (১ম তিন মিনিট: পৃথিবী সৃষ্টির আধুনিক দর্শন- উইনবার্গ, পৃষ্ঠা- ৯৪- ১০৫) এগুলো পৃথিবী সৃষ্টির মৌলিক উপাদান সমূহের মধ্যকার একটি বলে আধুনিক বিজ্ঞান নিশ্চিত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা উক্ত ধোয়া থেকে সৃষ্ট নতুন নতুন তারকা দেখতে পান। (দেখুন ১০ ও ১১ নং চিত্র) রাতে যে তারকা দেখা যায় তা আগে উক্ত ধোয়ার অংশ ছিল। অর্থাৎ, ধোয়া থেকেই এগুলোর উৎপত্তি হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

অর্থাৎ, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ। (সুরা হামীম সাজদাহ:১১)

পৃথিবীর আকাশে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি ও নক্ষত্র যোগুলোকে আমরা দেখি তার সবকিছুই ধোয়া থেকে তৈরী হয়েছে। অতএব, আমাদের এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই পূর্বে একটি মাত্র বস্তু ছিল তারপর এ গুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত ধোয়ার বাইরে একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أُولَٰئِكَ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা (কাফিররা) কি চিন্তা করে না যে, আকাশ ও পৃথিবী একিভূত ছিল (মুখ বন্ধ ছিল) অতঃপর আমি তাদেরকে আলাদা করেছি? (সুরা আশ্বিয়া:৩০)

বিশ্ববিখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ ও জার্মানীর জোহানেস গুটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান "আলফ্রেড ক্রোনার" বলেন: "আমরা চিন্তা করি- মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট কোথা থেকে এ সব বিষয়ের জ্ঞান এসেছে? আমি নিশ্চিত যে, পৃথিবী সৃষ্টির এ মৌলিক বিষয়ের খবর জানা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। কেননা, অল্প কিছুদিন আগে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা এগুলো সম্বন্ধে জানতে সক্ষম হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন: চৌদ্দশত বছর আগে যে মানুষটি পারমানবিক পদার্থ সম্বন্ধে জানতনা তার পক্ষে নিজের চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, আকাশ ও পৃথিবী মূলতঃ একই পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। (ভিডিও ডকুমেন্টারী "হাজিজি হিয়াল হাকীকাত" থেকে)

চিত্র- ১০

চিত্রে গ্যাস ও ধুলিবালি(Nebula) থেকে উৎপাদিত নতুন তারকা দেখা যাচ্ছে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির উপাদান উদ্ভব করার অংশ। (The space atlas, Heather and Henbest, পৃষ্ঠা- ৫০)



চিত্র- ১১

মেঘের লেক (The lagoon nebula); সেটা গ্যাস ও ধুলিবালির মেঘ। এর ব্যাস ৬০ আলোকবর্ষ। উচ্চতাপ সম্পন্ন তারকার অতি বেগুণী রংয়ের রশ্মি বিকিরণের ফলে এটি উত্তেজিত হয়। সম্প্রতি গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়েছে। (Horizons, Exploring the universe, seeds, plate 9, from association of universities for Research in astronomy,Inc )



## আল- কুরআন ও মানুষের মগজ

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে রাসুল (সাঃ) এর নামাজে বাধা দানকারী একজন নিকৃষ্ট মুশরিক সম্বন্ধে বলেন:

**كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَه لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)**

অর্থাৎ, ...কক্ষনো নয়।(খবরদার!) সে যদি বিরত না হয় (রাসুলের নামাজে বাধা দান থেকে) তবে, আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেচড়াবই। মিথ্যাচারী পাপী(র) কেশগুচ্ছ। (সূরা আলাক: ১৫- ১৬)

"**ناصية**" শব্দের অর্থ হচ্ছে মাথার কপাল। প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, আল্লাহ তায়ালা আয়াতে কপালের কথা প্রসংগে কেন বললেন যে, সেই কপাল মিথ্যাবাদী ও পাপী? কেন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন না যে, ব্যক্তিটি মিথ্যাবাদী ও পাপী? মাথার কপাল, মিথ্যা ও পাপের মধ্যে সম্পর্ক কি?

আমরা যদি কপাল ও মাথার খুলির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, কপালের সামনের দিকেই মগজের অবস্থান। (১২ নং চিত্র দেখুন)

আসুন! দেখি শরীর বিজ্ঞান মাথার সামনের দিকের কাজকর্ম সম্বন্ধে কি বলে?

Essentials of anatomy & physiology তথা "শরীরবিদ্যার মৌলিক উপাদান" গ্রন্থের লেখক এই অংশের কাজ সম্বন্ধে বলেন:

"কোন কিছু করার জন্য পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি ও উৎসাহ- উদ্দীপনা ইত্যাদি কপালের সামনের এই স্থান থেকেই উৎপন্ন হয়। আর এখানেই বহিরাবরণ সমূহের সম্মিলন ঘটেছে।" (শরীরবিদ্যার মৌলিক উপাদান- সিলি ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা- ২১১, মানব শরীর- নওবেক ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা- ৪১০- ৪১১)

লেখক আরও বলেন: কোন কিছু করার প্রতি প্রেরণা দানে কপালের অবদান থাকার কারণে তিনি বিশ্বাস করেন যে, মাথার কপাল কারও সাথে শত্রুতা করার মেইন পয়েন্ট বা কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং, মগজের স্থানটাই পরিকল্পনা, কোনকিছু করতে প্রেরণাদান, ভাল ও খারাপ কাজের দিকে ধাবিত করা ইত্যাদির জন্য দায়ী। মিথ্যা বা সত্য বলার ক্ষেত্রেও তার অবদান রয়েছে। তাই, মানুষ যখন মিথ্যা বলে বা পাপকাজ করে তখন মিথ্যা ও পাপ কাজের জন্য মাথার কপালকে দায়ী করাই শ্রেয়। যেমনটিই আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে করেছেন।

**كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَه لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)**

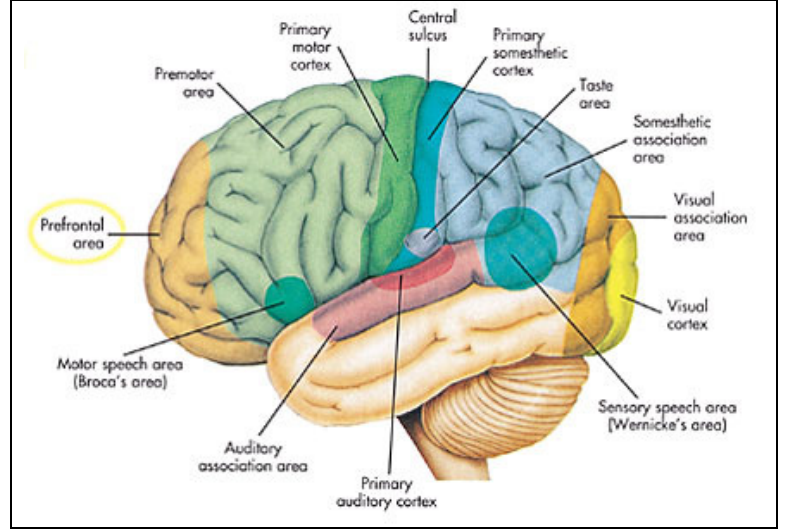
অর্থাৎ, ...কক্ষনো নয়।(খবরদার!) সে যদি বিরত না হয় (রাসুলের নামাজে বাধা দান থেকে) তবে, আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেচড়াবই। মিথ্যাচারী পাপী(র)

কেশগুচ্ছ। (সুরা আলাক: ১৫- ১৬) (শরীরবিদ্যার মৌলিক উপাদান- সিলি ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা- ২১১ দ্রষ্টব্য)

চিত্র- ১২

চিত্রে বাম দিকের অর্ধেকটাই মগজ। আর মগজের সামনেই রয়েছে কপাল।

মাথার কপালের এ সমস্ত কাজকর্মের কথা কেইখ এল. মুরের কথানুসারে বিগত ৬০ বছরের মধ্যে জানা গেছে। (ই'জাজুল ইলমী ফিন নাসিয়াহ- মুর ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা- ৪১)

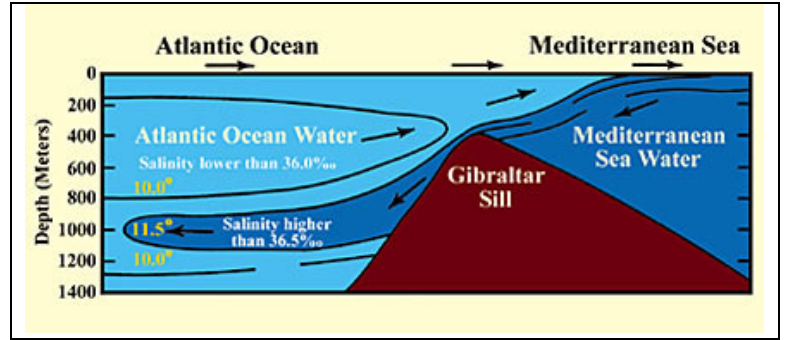


## কুরআন ও নদী- সমুদ্র

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, যে সমস্ত স্থানে ভিন্ন দুটি সমুদ্র একত্রিভূত হয়েছে সে সমস্ত স্থানে দুটি সমুদ্রের মাঝে (অদৃশ্য) অন্তরাল রয়েছে যা সমুদ্রদ্বয়ের ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং উভয়ের মাঝে নিজ নিজ গভীরতা, লবনাক্ততা ও ঘনত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে। (মহাসাগর জ্ঞানের গুরুকথা - ডেভিস, পৃষ্ঠা- ৯২- ৯৩) উদাহরণ স্বরূপ ভূমধ্যসাগর তারেক পাহাড় বা জিব্রাল্টার হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতরে তা কয়েকশত মাইল পর্যন্ত বয়ে গেছে প্রায় ১০০০ মিটার গভীরতাসহ। অথচ, তার ভিতরে বর্তমান রয়েছে নিজ নিজ উষ্ণতা, লবনাক্ততা ও ঘনত্বসহ অন্য সব গুণাবলী। এর পুরো স্থানেই রয়েছে ভূমধ্যসাগরের পানি। (মহাসাগর জ্ঞানের গুরুকথা - ডেভিস, পৃষ্ঠা- ৯৩) (১৩ নং চিত্র দেখুন)

### চিত্র- ১৩

ভূমধ্যসাগরের পানি তারেক পাহাড় (জিব্রাল্টার) হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করেছে নিজ গুণাবলী তথা নিজস্ব উষ্ণতা, লবনাক্ততা ও ঘনত্ব সহ। এমনটি হয়েছে উভয়ের মধ্যকার অন্তরালের কারণে। (তাপমাত্রা সেলসিয়াসে)



এ সব সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গমালা , প্রবল স্রোত ও জোয়ার ভাটা থাকা সত্ত্বেও তাদের পানি একত্রিত হয় না এবং তাদের মধ্যকার অন্তরালকে অতিক্রম করে না। আল্লাহ তায়ালা এই অন্তরাল সম্বন্ধে বলেন- পাশাপাশি বয়ে যাওয়া দুই সমুদ্র তাদের মধ্যকার অন্তরালকে অতিক্রম করে না। কোরআন মাজীদে এসেছে-

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20)

অর্থাৎ, তিনি পাশাপাশি দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল। তারা তাকে অতিক্রম করে না। (সূরা আর রহমান: ১৯- ২০)

তবে, কোরআনে যখন মিষ্টি ও লবনাক্ত পানির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে তখন উভয়ের মধ্যকার অন্তরালের সাথে সাথে "প্রতিবন্ধক" বাধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ  
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53)

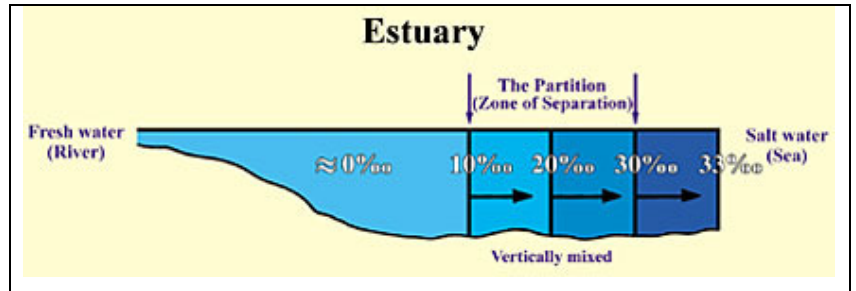
অর্থাৎ, তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন এটি মিষ্টি, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায় ও দুর্ভেদ্য আড়াল। (সুরা ফুরকান:৫৩)

কেউ প্রশ্ন করতে পারে- "কেন আল্লাহ তায়ালা মিষ্টি ও লবনাক্ত পানির মধ্যকার অবস্থা সম্বন্ধে অন্তরালের সাথে পর্দা তথা বাধার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু, দুই সমুদ্রের মাঝখানের অবস্থা সম্বন্ধে অন্তরালের সাথে বাধার কথা উল্লেখ করেননি?"

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, নদী সমুদ্রের একত্রিত হওয়ার স্থান তথা মোহনায় যেখানে মিষ্টি ও লবনাক্ত পানির সম্মিলন ঘটে সেখানকার অবস্থা দুই সমুদ্রের সম্মিলন স্থলের অবস্থা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রমাণিত হয়েছে যে, মোহনাজলে মিষ্টি পানি ও লবনাক্ত পানির ঘনত্বে রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য; যা তাদের দুটি স্তরকে মিশে যাওয়া থেকে বাধা দান করে। আর এই পার্থক্যস্থলের লবনাক্ততার মাত্রা বাকী অংশের মিষ্টি ও লবনাক্ত পানির বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন হয়। (মহাসাগর জ্ঞান- গ্রোস, পৃষ্ঠা- ২৪২, সমুদ্র জ্ঞানের শুরুকথা- থুরমান, পৃষ্ঠা- ৩০০- ৩০১) (দেখুন- ১৪নং চিত্র)

চিত্র- ১৪

উপরের চিত্রটি মোহনাজলের লবনাক্ততার মাত্রা দেখাচ্ছে। (১০০০% হিসেবে) আমরা এখান থেকে মিষ্টি ও লবনাক্ত পানির পার্থক্যস্থল দেখতে পাই। (মহাসাগর জ্ঞানের শুরুকথা - থুরমান, পৃষ্ঠা- ৩০)



(Introductory Oceanography- Thurman)

সাম্প্রতিক সময়ে এটা আবিষ্কৃত হয়েছে অত্যাধুনিক তাপ, লবন, ঘনত্ব ও অক্সিজেন মাপক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা চালানোর পর।

কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় দুই সমুদ্রের মধ্যকার উক্ত বাধ বা প্রতিবন্ধককে খালি চোখে দেখা। সেগুলো দেখলে আমাদের কাছে মনে হবে সমুদ্র একটিই দু'টি নয়। অনুরূপভাবেই খালি চোখে নদী ও সমুদ্রের মোহনাকেও মিষ্টি পানি, লবনাক্ত পানি ও প্রতিবন্ধক এই তিনভাগে ভাগ করা অসম্ভব।



## কুরআন, গভীর সমুদ্র ও আভ্যন্তরীণ উর্মিমাল্লা

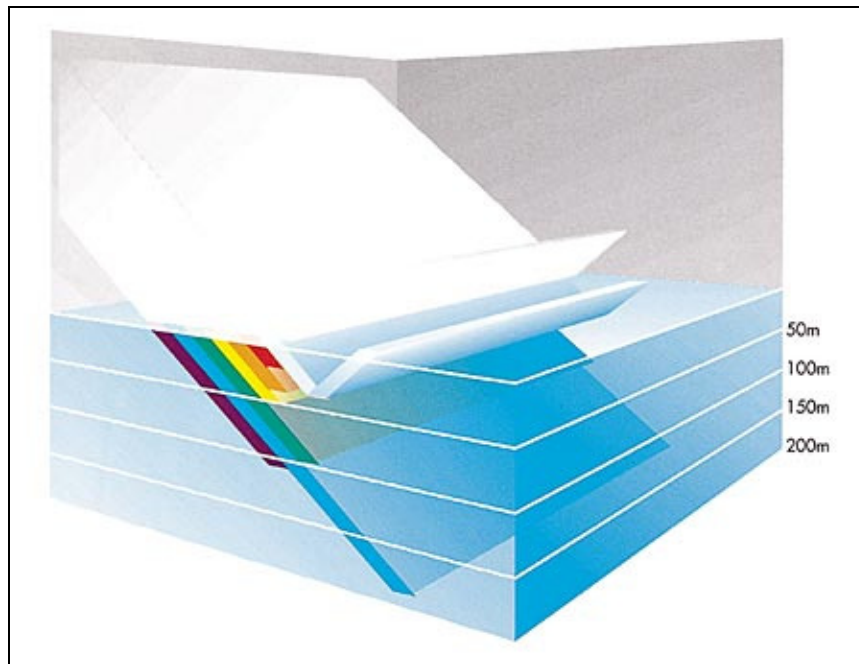
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল- কুরআনে বলেন:

أَوْكُظُّمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ  
ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ  
اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40)

অর্থাৎ, অথবা তাদের কর্ম সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরংগের উপর তরংগ, তার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের পর এক অন্ধকার। যখন সে হাত বের করে তখন তাকে একেবারেই দেখতে পারে না। আল্লাহ যাকে জোতি দেননা তার কোনই জোতি নেই। (সুরা নূর:৪০)

মহাগ্রন্থ আল- কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সমুদ্র ও মহাসাগরের মধ্যকার অন্ধকারের বর্ণনা দিয়েছেন। সমুদ্রের তলদেশে কোন মানুষ হাত বের করলে তার কিছুই দেখতে পারে না। সমুদ্র ও মহাসাগরে প্রায় ২০০ মিটারের নিচে সাধারণত কোন আলোই থাকে না। সেখানে থাকে শুধুই অন্ধকার। (মহাসাগর- এলডার ও পার্নেট্টা, পৃষ্ঠা- ২৭) (দেখুন ১৫ নং চিত্র) এ ছাড়া ১০০০ মিটারের নিচে কোন আলোর চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। তবে, কোন মানুষ আধুনিক সরঞ্জামাদি ও সাবমেরিনের সহায়তা ছাড়া পানির ৪০ মিটারের নিচে যেতে পারে না।

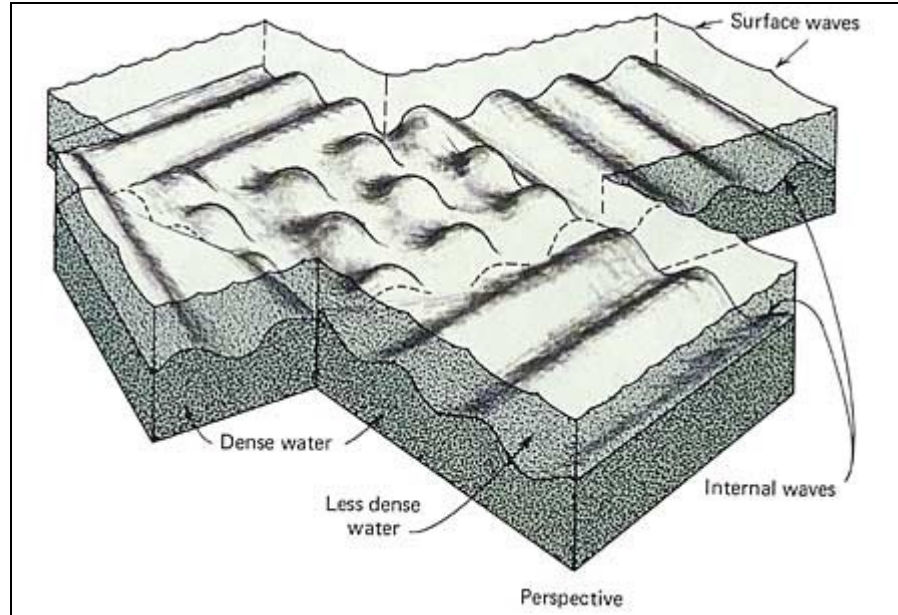
চিত্র- ১৫



শতকরা ৩ থেকে ৩০ ভাগ সূর্যের আলো সমুদ্রের উপরিভাগে প্রতিবিম্বিত হয়। তখন একের পর এক আলোর সাতটি রঙ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে সবুজ রঙ ছাড়া অন্যান্য রঙ প্রথম ২০০ মিটার গভীর পর্যন্ত যায়। (মহাসাগর, পৃষ্ঠা- ২৭) বিজ্ঞানীরা আধুনিক প্রযুক্তি ও সাবমেরিনের সহায়তায় মহাসাগরের গভীরে অন্ধকারকে প্রমাণ করেছেন।

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা আরেকটা বিষয় বুঝতে পারি সেটা হল- সাগর ও মহাসাগরের গভীরস্থ পানি ঢেউ দ্বারা ঢাকা থাকে তার উপরেও থাকে অন্য ঢেউ। এটা সত্য যে, উক্ত দ্বিতীয় প্রকার ঢেউ হচ্ছে সমুদ্রের উপরিভাগের ঢেউ যা মানুষ দেখতে পায়। কারণ, কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে দ্বিতীয় ঢেউয়ের উপর রয়েছে মেঘ। তাহলে, প্রথম ঢেউয়ের বিষয়টা কি? সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, সমুদ্রের ভিতরে আরও ঢেউ রয়েছে। (বিভিন্ন স্তরের ঘনত্বের ভিন্নতার কারণে এর সৃষ্টি হয়।) (মহাসাগর জ্ঞান- গ্রোস, পৃষ্ঠা- ২০৫)

চিত্র- ১৬



চিত্রে দু'স্তরের ভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট পানির আভ্যন্তরীণ ঢেউ। একটি বেশী ঘনত্ব বিশিষ্ট (নিচে) এবং অপরটি একটু কম ঘনত্ব বিশিষ্ট (উপরে) (মহাসাগর জ্ঞান, পৃষ্ঠা- ২০৪, Oceanography)

ভিতরের ঢেউ সাগর ও মহাসাগরের নিম্নদেশের পানিকে ঢেকে রাখে। কারণ, নিম্নদেশের পানির ঘনত্ব উপরস্থ পানির ঘনত্বের চেয়ে বেশী। এবং উপরের ঢেউ যে কাজ করে নিম্নদেশের ঢেউয়ের কাজ ও তাই। উপরের ঢেউয়ের মত নিম্নদেশের ঢেউ ও আশে পাশের স্থাপনা ভেঙে ফেলতে সক্ষম। তবে, পার্থক্য হচ্ছে- উপরের ঢেউয়ের মত নিম্নদেশের ঢেউ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। এবং এটা শুধুমাত্র তাপ ও লবনাক্ততা পরিবর্তনকারী বিষয়ের সহায়তায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে গবেষণার মাধ্যমেই জানা সম্ভব হবে। (মহাসাগর জ্ঞান- গ্রোস, পৃষ্ঠা- ২০৫)

## কুরআন ও মেঘমালা

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের মেঘমালার উপর গবেষণা করেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, বৃষ্টিবাহী মেঘ নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়। তা গঠিত হয় নির্দিষ্ট প্রকারের বাতাস ও মেঘ দ্বারা। এক প্রকার মেঘের নাম "সাহাবুর রুকাম তথা মেঘপুঞ্জ" (Cumulonimbus) মহাকাশ বিজ্ঞানীরা উক্ত মেঘের গঠন, বৃষ্টি, শীলা ও বিজলী নিয়ে গবেষণা করেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত মেঘপুঞ্জ বৃষ্টি তৈরীর জন্য নিম্নের প্রক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করে থাকে।

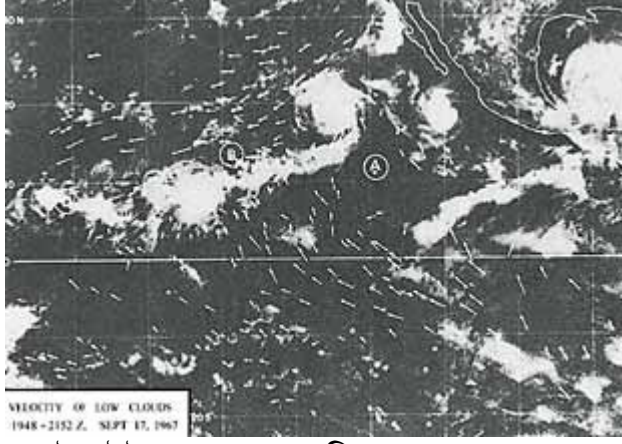
১. বাতাস কর্তৃক মেঘকে ধাক্কা দেয়া: ছোট ছোট মেঘ খন্ডকে বাতাস যখন ধাক্কা দেয় তখন "সাহাবুর রুকাম বা বৃষ্টিবাহী মেঘপুঞ্জ" নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তৈরী হতে শুরু করে। (১৭ ও ১৮ নং চিত্র দেখুন)

২. মেঘখন্ডের মিলন: ছোট ছোট মেঘখন্ড একসাথে মিলিত হয়ে বড় মেঘমালায় পরিণত হয়। (বায়ুমন্ডল- এন্সেস ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা- ২৬৮- ২৬৯, বায়ু বিজ্ঞান- মিলার ও থমসন, পৃষ্ঠা- ১৪১) (দেখুন ১৮- ১৯ নং চিত্র)

৩. স্তম্ভ করে রাখা: যখন ছোট ছোট মেঘ খন্ড একত্রে মিলিত হয় তখন তা উচু হয়ে যায় এবং উড্ডয়মান বাতাসের গতি পার্শ্ববর্তী স্থানের তুলনায় মেঘের মূল কেন্দ্রের নিকটে বৃদ্ধি পেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। এই উড্ডয়মান বাতাসের গতি মেঘের আকার বৃদ্ধি করে মেঘকে স্তম্ভীকৃত করতে সাহায্য করে। (দেখুন- ১৯.B, ২০ ও ২১নং চিত্র)

এই মেঘের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে মেঘটা বায়ুমন্ডলের অধিকতর ঠান্ডা স্থানের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে সেখানে পানির ফোটা ও বরফের সৃষ্টি করে এবং তা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। এরপর যখনই এগুলো অধিক ওজন বিশিষ্ট হয়ে যায় তখন বাতাস আর তাকে কন্ট্রোল করতে পারে না। ফলে, মেঘমালা থেকে তা বৃষ্টি ও শীলা হিসেবে বর্ষিত হয়। (বায়ুমন্ডল- এন্সেস ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা- ২৬৯, বায়ু বিজ্ঞান- মিলার ও থমসন, পৃষ্ঠা- ১৪১)

চিত্র- ১৭



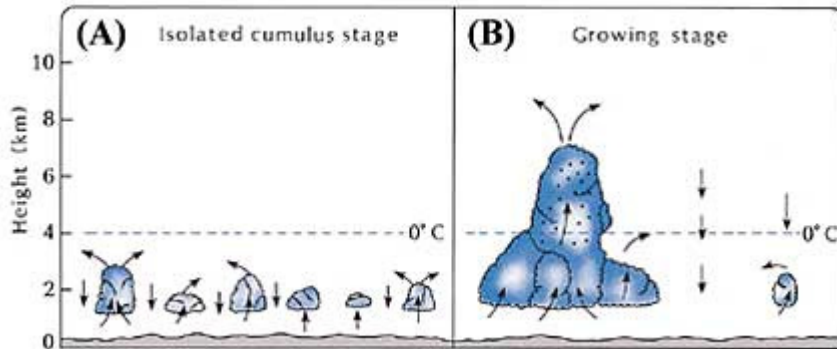
স্যাটেলাইট থেকে নেয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, মেঘ B,C ও D এর মিলন স্থলের দিকে ঘূর্ণায়মাণ। তীর চিহ্নগুলো বাতাসের গতিপথ নির্দেশ করছে। (বায়ুমন্ডলের বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস জানতে স্যাটেলাইটের ছবি ব্যবহার- এন্ডারসন ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা- ১৮৮)

চিত্র- ১৮



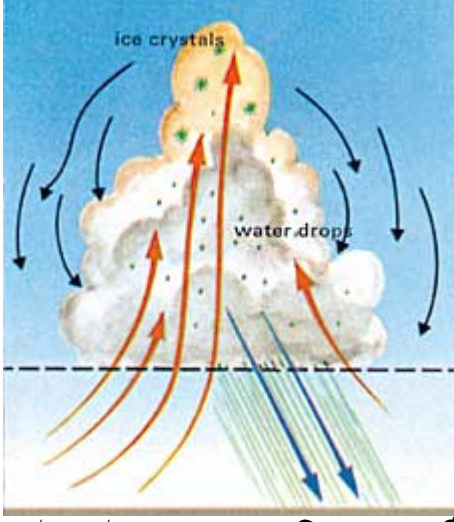
মেঘের ছোট ছোট টুকরা (স্তুপীকৃত মেঘমালা Cumulus) ছুটাছুটি করছে শেষ প্রান্তের বড় মেঘখন্ডের নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে। (বাড় ও মেঘমালা- লুডলাম ৭.৪ Clouds and storms. Ludlam)

চিত্র- ১৯



(A) বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট মেঘমালা একত্রিত হয়ে বড় মেঘে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। (B) ছোট ছোট মেঘ কণাগুলো একত্রিত হয়ে বড় মেঘমালায় পরিণত হয়ে ফোটা ফোটা পানিতে পরিণত হয়েছে। পানির ফোটা (\*) চিহ্নিত। (বায়ুমন্ডল- এভেস ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা- ২৬৯ / The atmosphere)

চিত্র- ২০



ছোট ছোট মেঘখন্ড একত্রিত হয়ে গঠিত "সাহাবুর রুকাম বা বৃষ্টিবাহী মেঘপুঞ্জ" থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। (আল- জাওয়ু ওয়াল মানাখ (আবহাওয়া ও বায়ুমন্ডল)- বুডিন, পৃষ্ঠা- ১২৩)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى  
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ

অর্থাৎ, তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তায়ালা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন? তারপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, এরপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন? অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা বর্ষিত হয়। (সুরা নূর: ৪৩)

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি কম্পিউটার, বিমান, স্যাটেলাইট সহ বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা পরিবর্তন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণার যন্ত্রপাতিসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মেঘের সৃষ্টি, গঠন প্রণালী ও তার কাজ- কর্ম সম্বন্ধে জেনেছেন। (ই'জাজুল কুরআনিল কারীম ফি ওয়াসফি আনওয়ায়ির রিয়াহি ওয়াস সিহাবি ওয়াল মাত্বার- ম্যাকি ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা- ৫৫)

মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করার পর কুরআন বরফ ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। আল্লাহ বলেন:

وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ  
عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43)

অর্থাৎ, আর তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তম্ভ থেকে শিলাবর্ষণ করেন। এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক যেন তার দৃষ্টিশক্তিকে বিলীন করে দিতে চায়। (সুরা নূর:৪৩)

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, সাহাবে রুকাম তথা বৃষ্টিবাহী মেঘপুঞ্জ; যা থেকে শিলা- বৃষ্টি বর্ষিত হয় তার উচ্চতা ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ ফুট বা ৭.৪০ থেকে ৭.৫০ মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে। (মহাকাশ বিজ্ঞান- মিল্লার ও থম্বসন, পৃষ্ঠা- ১৪১)

তাকে পাহাড়ের মতই দেখায় যেমনটি আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন: " وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ " অর্থাৎ, আর তিনি আকাশস্থিত পাহাড় (শিলাস্তম্ভ) থেকে শিলাবর্ষণ করেন। (দেখুন- ২১ নং চিত্র)

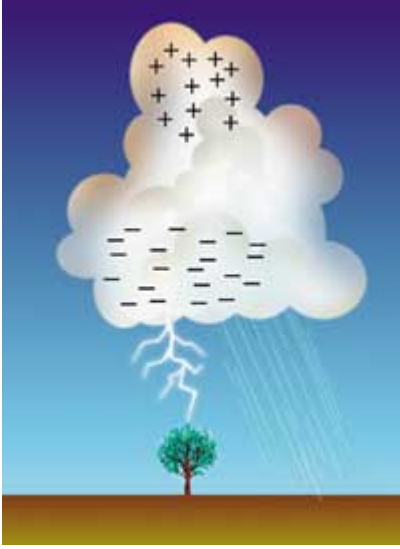
চিত্র- ২১



সাহাবে রুকাম বা বৃষ্টিবাহী মেঘ।

এই আয়াত নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে- আয়াতে " سَنَا بَرْقِهِ " (বিদ্যুৎঝলক) বলা হল কেন?

যা বরফের দিকে নির্দেশ করে? তাহলে কি তার অর্থ দাঁড়ায় যে, শিলাই বিদ্যুৎঝলক সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা রাখে?



আসুন! আমরা দেখি "বর্তমান মহাকাশ বিজ্ঞান" (Meteorology Today) গ্রন্থ এ সম্বন্ধে কি বলে? উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে- বরফ পড়ার দ্বারা মেঘে বৈদ্যুতিক চার্জের সৃষ্টি হয়। পানি ফোটার সাথে বরফের সামান্য সংস্পর্শ পেয়েই জমাট বেধে তাতে গোপন তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়। আর বরফ টুকরার কারণে উক্ত বরফ পৃষ্ঠে সমুদ্র পৃষ্ঠের চেয়ে বেশী তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়, এ ছাড়া এখানে আরেকটা আশ্চর্যজনক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়; তাহল- এখানে বিদ্যুত অধিক ঠান্ডা থেকে অধিক গরমে পরিণত হয়ে নেগেটিভ চার্জের সৃষ্টি করে, এমনিভাবে ঠান্ডা পানির ফোটার সাথে বরফের সংস্পর্শের পর এর ছোট ছোট কণাগুলো পজেটিভ চার্জ হয়ে উর্ধ্বগামী বাতাসের মাধ্যমে মেঘের উপরে চলে যায় এবং অন্য শিলাগুলো নেগেটিভ চার্জ হয়ে মেঘের নিচের দিকে চলে আসে, এখানে মেঘের নিচের অংশেও নেগেটিভ চার্জ হয়, আর এই নেগেটিভ চার্জই বিদ্যুত হয়ে প্রজ্জলিত হয়, সারকথা হল- শিলাই বিদ্যুত সৃষ্টির প্রধান উপকরণ।

অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বিদ্যুতবালক সম্বন্ধে এ সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করেছেন। প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দার্শনিক এরিস্টোটলের তত্ত্বই সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। তিনি বলেছিলেন: বায়ুমন্ডল দুঃটি নিঃশ্বাসের সম্মিলনের ফলাফল: আর্দ্র ও শুকনো। তিনি আরও বলেছেন: বজ্রধ্বনি হল শুকনো নিঃশ্বাসের সাথে অত্যাচারী মেঘের সংঘর্ষের ফল। আর বিদ্যুতবালক হল ভীতিকর আগুনের মত করে শুকনো নিঃশ্বাসকে পুড়িয়ে দেয়া। ( এরিস্টোটলের কর্ম: মহাকাশ বিজ্ঞান- রউস ও অন্যান্য, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৯a, ৩৬৯b) ইংরেজীতে অনুদিত।

এগুলো মহাকাশ সংক্রান্ত তথ্যাদির মধ্যকার কিছু তথ্য; যা ১৪০০ বছর আগে কুরআন নাযিলের সময় থেকেই তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

## কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিজা:বিজ্ঞানীদের মতামত

কুরআন শরীফের বৈজ্ঞানিক মু'জিজা বা মিরাকল সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কিছু বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হল। এগুলো " হাজিহী হিয়াল হাকীকাহ" (এটাই বাস্তবতা) নামক ভিডিও ডকুমেন্টারী থেকে সংকলিত হয়েছে। এই ভিডিওতে আপনি ওই সমস্ত বিজ্ঞানীদের ছবি ও বক্তৃতা দেখতে ও শুনতে পারবেন।

(এই ভিডিও 'র কপি পেতে বা কম্পিউটারে তা দেখতে ইন্টারনেটে

[www.islam-guide.com/truth](http://www.islam-guide.com/truth) ব্রাউজ করতে পারেন।)

১. ড. টি.ভি. এন. পারসাউড: তিনি কানাডার মানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের (উইনিপেগ, মানিটোবা, কানাডা) এনাটমী বা শরীরবিদ্যা, শিশু স্বাস্থ্য, মহিলা রোগ, প্রসুতি ও যৌনরোগ বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ওখানে এনাটমী বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন ১৬ বছর। এ সেক্টরে অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব, তিনি ২২ টি বইয়ের লেখক ও সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া তার ১৮১ টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে তিনি কানাডার এনাটমী বা শরীরবিদ্যা বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রদত্ত J.C.B নামক বিখ্যাত পুরস্কার পেয়েছিলেন।

যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল- তার নিজের গবেষণায় প্রমাণিত কুরআন শরীফের বৈজ্ঞানিক মু'জিজা বা মিরাকল সম্বন্ধে, তখন তিনি বললেন: আমার কাছে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন অতি সাধারণ প্রকৃতির মানুষ। তিনি পড়তে বা লিখতে জানতেন না এবং এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তিনি ছিলেন নিরক্ষর। আর আমরা কথা বলছি বারোশত বছর (আসলে বর্তমান সময় থেকে চৌদ্দশত বছর) আগের কথা। চৌদ্দটি শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। আমরা এমন একজন নিরক্ষর লোকের সামনে রয়েছি যিনি গভীর ও বিস্তারিত জ্ঞানসমৃদ্ধ এমন সব কথা বলছেন যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। তা আসলেই বিস্ময়ের ব্যাপার। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে আকস্মিকতা বলে মেনে নিতে পারি না। কেমন করে করে আকস্মিকতা হতে পারে? ওখানে (কুরআনে) প্রচুর বিষয় আছে যা বিজ্ঞানের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি ড. মুরের মতই বলি যে, আমার এগুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে দ্বিধা নেই যে, এগুলো স্রষ্টার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনিই এ বিষয়গুলোকে জানিয়ে দিয়েছেন।..... ড. পারসাউড তার লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে কুরআনের বেশ কিছু আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কনফারেন্সেও তা উল্লেখ করেছেন।

২. ড.জো লেই.সিম্পসন: তিনি আমেরিকার বায়লোর বিশ্ববিদ্যালয়ের (হোস্টন, টেক্সাস) মেডিক্যাল বিভাগের অধীনে প্রসুতি, মহিলা রোগ ও জীনতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং টেনিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মেমফিস, টেনিসি, যুক্তরাষ্ট্র)



প্রসূতি ও মহিলা রোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এছাড়া তিনি "এমেরিকান ফার্মিটিস সোসাইটি" র প্রধান ছিলেন। ড.জো. লেই.সিম্পসন অনেকগুলো পুরস্কার অর্জন করেছেন তন্মধ্যে ১৯৯২ সালে "প্রসূতি ও মহিলা রোগ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক সংস্থা" কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। তিনি রাসুল (সাঃ) এর দু'টি হাদীসের উপর গবেষণা চালিয়েছেন। হাদীস দুটি হল:-

১. রাসুল (সাঃ) বলেন:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন রেখে দেয়া হয়।... (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

২. রাসুল (সাঃ) বলেন:

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا

অর্থাৎ, যখন বীর্যের বয়স ৪২ রাত অতিবাহিত হয় আল্লাহ তায়ালা তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। তিনি তার আকৃতি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চামড়া, গোশত ও হাড় তৈরী করে দেন। (মুসলিম শরীফ)

তার গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, মাতৃগর্ভের প্রথম ৪০ দিনে ভ্রূন একটি বিশেষ সময় অতিক্রম করে। তিনি এ হাদীস দুটির সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। তিনি একটি কনফারেন্সে এ হাদীস উল্লেখ করে বলেন: মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই হাদিস দুটি আমাকে ভ্রূনের প্রথম চল্লিশ দিনের সময়সূচী জানতে সাহায্য করেছে। আজকে সকালে একই কথা উচ্চারণ করেছেন আমাদের আরও দু'জন বক্তা। এটা যখন লেখা হয়েছে তখন তা বিজ্ঞানের গবেষণার ভিত্তিতেই লেখা হয়েছে এটা ধারণা করা অমূলক। কারণ, জীনতত্ত্ব ও ধর্মের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। এ ছাড়াও ধর্ম বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। কুরআন শরীফে বহু তথ্য আছে সেগুলো বিগত কয়েক শতাব্দী যাবত ঘোষণা ও প্রমাণ করে আসছে যে, কুরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ।...

৩. ড. ই.মার্শাল জনসন: তিনি দীর্ঘ ২২ বছর যাবত আমেরিকার থমাস জেফার্সন বিশ্ববিদ্যালয়ের (ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভেনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র) এনাটমী (শরীরবিদ্যা) ও উচ্চতর বায়োলজী (জীববিজ্ঞান) বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি দানিয়েল বাউ ইন্সটিটিউট (Daniel Baugh institute) এবং "সৃষ্টির বিস্ময় গবেষণা সংস্থা"র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ড. জনসনের রয়েছে দুই শতাধিক প্রকাশনা। ১৯৮১ সালে সউদী আরবের দাম্মামে অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল কনফারেন্স চলাকালীন সময়ে ডক্টর জনসন তার গবেষণা জমা দানের সময় বলেছিলেন: "সংক্ষেপে আল-কুরআন ক্রনের শুধু বাহ্যিক দিকের উপরেই আলোচনা করেনি বরং, আভ্যন্তরীণ স্তরগুলো নিয়েও আলোচনা করেছে। আভ্যন্তরীণ যে স্তরসমূহ বর্ণনা করেছে তন্মধ্যে তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া উল্লেখযোগ্য মৌলিক বিষয় যা আধুনিককালের বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন: আমি নিজে বিজ্ঞানী হওয়ার কারণে আমি আমার সামনের বিষয়গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি। ফলে, ক্রনবিজ্ঞান, উচ্চতর জীববিজ্ঞান ও কুরআন থেকে অনুদিত শব্দগুলোর অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে পারি। আমি আগেই উদাহরণ দিয়েছি যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত আমি বর্তমানে যা জানি ততটুকু জ্ঞান নিয়ে আগেকার ওই যুগে যেতে পারতাম (আমি হতাম সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি) এবং আমার যোগ্যতা থাকত কোনকিছুকে ভালভাবে উপস্থাপনা করার তবুও, আমি কুরআন যেভাবে বর্ণনা করেছে তদ্রূপ কোন বিষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে অপারগ হতাম। আমি এ চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করার কোন যুক্তি খুঁজে পাই না যে, মুহাম্মদ (সাঃ) যে কোন স্থান থেকে এ তথ্যগুলো পেয়েছেন এবং এতে স্রষ্টার কারসাজি আছে এগুলোর ভিতরে আমি কোন বৈপরিত্য দেখি না। কেননা, মুহাম্মদ (সাঃ) এগুলো লিখতে পারেন না। (মুহাম্মদ সা. ছিলেন নিরক্ষর। তিনি লেখা বা পড়া কিছুই জানতেন না। বরং, সাহাবীদের দিয়ে তা লেখাতেন এবং তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করতেন। )

৪. ডক্টর উইলিয়াম ডব্লিউ হে : তিনি একজন বিখ্যাত সমুদ্র বিজ্ঞানী এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের (বোল্ডার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র) ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। এর আগে তিনি "রজেন্টিয়াল স্কুল অফ মেরিন ও মায়ামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (মায়ামী, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র) বায়ুমণ্ডল বিজ্ঞান" বিভাগের ডীন ছিলেন। সমুদ্র সংক্রান্ত কুরআনে উল্লেখিত বিষয়ের যেগুলো আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করার পর তিনি বলেন: "এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এ ধরনের বিষয় প্রাচীন গ্রন্থ কুরআন শরীফে রয়েছে। অথচ, ইতিপূর্বে এর উৎস সম্বন্ধে আমার জানার সুযোগ হয়নি। আরও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কথা হল এই তথ্যগুলো এখানে আছে। আর এ গবেষণা এবং আবিষ্কারও তার কিছু বাক্যের মর্মার্থ জানার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।" ড. উইলিয়াম হে কে প্রশ্ন করা হল- কুরআনের উৎস তাহলে কি হতে পারে? তিনি বলেন: ভাল কথা। আমি মনে করি অবশ্যই তা স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ।...

৫. ড. জেরাল্ড সি. জিওরিঙ্গার: তিনি একজন বক্তা ও জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের (ওয়াশিংটন, আমেরিকা) মেডিক্যাল অনুষদের অধীনে জীববিজ্ঞান বিভাগের (কোষ) ক্রন- চিকিৎসা বিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। সউদী আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টম

মেডিক্যাল কনফারেন্সে গবেষণা পেপার জমাদানকালে তিনি বলেছিলেন: " কুরআনের কিছু আয়াত ব্যাপকভাবে বীর্যের সংমিশ্রণকাল থেকে শুরু করে অংগ- প্রত্যংগ সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত মানব ক্রনের সমস্ত ব্যাপারে আলোচনা করেছে।" এর আগে গ্রন্থ, পরিভাষা ও গুণাবলীর দিক থেকে মানব ক্রনের বৃদ্ধিপাণ্ড হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে এত স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আর কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে, পূর্ণাঙ্গ না হলেও মানুষের সন্তান ও ক্রন বৃদ্ধির স্তরসমূহ বিভিন্ন পুরাতন তাত্ত্বিক গ্রন্থে বেশ কয়েক শতাব্দী আগেই লিখিত ছিল।

৬. ড. বুশিহাইড কোজাই: তিনি জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের (হংগো,টোকিও) অধ্যাপক ও জাতীয় মহাকাশ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্রের (মিটাকা, টোকিও, জাপান) প্রধান ছিলেন। তিনি বলেন: আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ছিল- আমি মহাকাশের বিভিন্ন প্রমাণিত সত্য তথ্যাদি কুরআন শরীফে পেয়েছি। আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর খুব কম বিষয়ই আবিষ্কার করতে পেরেছে। আমরা আমাদের পরিকল্পনা ও অক্লান্ত চেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর খুব কমই জানতে পেরেছি। কারণ, আমরা টেলিস্কোপ ও আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করে পুরো সৌরজগতের ব্যাপারে চিন্তা করা তো দূরের কথা এর অত্যন্ত সামান্য অংশ দেখতে পাই। কুরআন অধ্যয়ন ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার পর আমি আগামীতে বিশ্বজগত নিয়ে গবেষণার নতুন পথের সন্ধান পেয়ে যাব।

৭. প্রফেসর টেজাটাট টেজাসেন: তিনি থাইল্যান্ডের শিয়াংমাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিদ্যা বিভাগের প্রধান। পূর্বে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগের ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সউদী আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টম মেডিক্যাল কনফারেন্স চলাকালে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন: গত তিন বছর যাবত আমি কুরআন শরীফকে গুরুত্ব দিতে লাগলাম। আমার গবেষণা এবং এই কনফারেন্স থেকে যা শিখলাম তার ফলে আমার মনে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, সমস্ত বিষয়ই মহাগ্রন্থ আল- কুরআনে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এবং এর সব বিষয় বিজ্ঞান দ্বারা সত্য প্রমাণ করা সম্ভব। রাসুল (সাঃ) পড়তে বা লিখতে জানতেন না। অবশ্যই তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত দূত। এগুলো অন্ধকারে আলোর দিশা হিসেবে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকেই তার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর নিশ্চিতভাবেই সেই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন। অতএব, আমাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে " **لا إله إلا الله محمد رسول** "

**الله** " অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার রাসুল এ কথা বলার। সর্বশেষে সুন্দর এ কনফারেন্সের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি শুধুমাত্র দ্বীনী ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই যে উপকার পেয়েছি তা নয় বরং, আমার সৌভাগ্য হয়েছে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাত করার। কনফারেন্সে যোগদানকারীদের মধ্য থেকে অনেক নতুন নতুন লোককে বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। তবে, এখানে এসে সবচাইতে বড় যে জিনিসটা আমি লাভ করতে পেরেছি তা হল- " **لا إله** "

إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ " (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ)। এটা পড়ে  
আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

কুরআন শরীফে বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যগুলো বর্তমান থাকার উদাহরণ এবং এ সম্বন্ধে  
বিজ্ঞানীদের বক্তব্য উল্লেখ করার পর আমরা নিজেদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করব। প্রশ্ন গুলো  
হল-

১. আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক প্রমাণিত যেসব তথ্য চৌদ্দশত বছর আগে কুরআন শরীফে  
বর্ণিত হয়েছে তা কি আসলে অপ্রত্যাশিতভাবে মিলে গেছে?

২. এটা কি সম্ভব যে এই কুরআন মুহাম্মদ (সাঃ) নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি লিখেছেন?

একমাত্র উত্তর হল- মহাগ্রন্থ আল- কুরআন আল্লাহ তায়ালায় আক্ষরিক বাণী। এটি মহান  
আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে তার কাছে নাযিল হয়েছে।

( আরও বিস্তারিত জানতে [www.islam-guide.com/science](http://www.islam-guide.com/science) তে ব্রাউজ করতে  
পারেন অথবা বইয়ের শেষে উল্লেখিত সংস্থাসমূহে যোগাযোগ করতে পারেন।)

## ২. একটি সুরা এনে দিতে চ্যালেঞ্জ:

আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا  
شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ  
تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ  
(24) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার (মুহাম্মদ সা.) প্রতি যা নাজিল করেছি তাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে, এর মত একটি সুরা রচনা করে নিয়ে আস। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব সাহায্যকারীদের সংগে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি না পার; অবশ্য তা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর যার জালানী হবে মানুষ আর পাথর। সেটা প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য। আর হে নবী! (সাঃ), যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহমান থাকবে। (সুরা বাকারা: ২৩- ২৫)

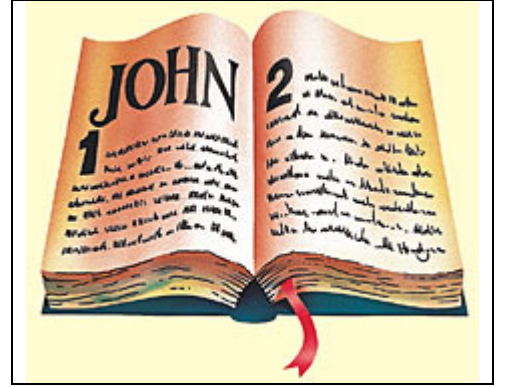
কুরআন নাযিলের পর থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু, কেউ কুরআনের সুরার মত সৌন্দর্য, ভাষার অলংকার ও অন্যান্য গুণাবলীসমৃদ্ধ একটি সুরা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি।

উদাহরণ স্বরূপ কুরআন শরীফের ছোট সুরা "আল কাউসার" (সুরা নং ১০৮) এর শব্দ সংখ্যা মাত্র ১০। এতদসত্ত্বেও অতীত ও বর্তমান কালের কেউ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসেনি। (আল- বুরহান ফি উলুমিল কুরআন, দ্বিতীয় খন্ড- ২২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কিছু মুশরিক (পৌত্তলিক) মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শত্রুতাবশতঃ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদ (সাঃ) নবী নন তা প্রমাণ করা। কিন্তু, তাদের নিজেদের ভাষায় কুরআন মাজীদ নাজিল হওয়া সত্ত্বেও তারা তাতে ব্যর্থ হয়। অথচ, রাসুল (সাঃ) এর সময়কার আরবরা আরবী ভাষা ও তার অলঙ্কার শাস্ত্রে খুবই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল। তারা কবিতা রচনা করত তাতে ব্যবহার করত অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ভাষালংকার। এখনও লোকেরা তাদের সেই কবিতা আবৃত্তি করে রীতিমত আশ্চর্য হয়।

## ৩. মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে বাইবেলের ভবিষ্যতবাণী:

বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের ভবিষ্যতবাণী ইসলামের সত্যতারই একটা প্রমাণ। এ ছাড়া সেটা বাইবেলে বিশ্বাসী মানুষদের চোখের সামনেও মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওতের একটা প্রমাণ।



"মুসা (আঃ) বলেন: আল্লাহ তায়ালা আমাকে বললেন:

তারা যা বলেছে তাতে ভালই করেছে। তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবীকে প্রেরণ করা হবে তোমার মত। আমি তার মুখে আমার কথা দিয়ে দেব। তিনি আমার নির্দেশিত বাণী দিয়ে কথাবার্তা বলবেন। আর যারা তার মুখস্থিত আমার কথা না শুনবে তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করব।" (Deuteronomy 18 দ্রষ্টব্য)

উক্ত উক্তির সারাংশ স্বরূপ: আবির্ভূত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

১. তিনি হবেন মুসা (আঃ) এর মত।
২. তিনি ঈসরাঈলীদের ভাইদের তথা ঈসমাঈলীয় বংশ থেকে আসবেন।
৩. আল্লাহ তায়ালা নিজ বাণীকে তার মুখে দিয়ে দিবেন। তিনি তার নির্দেশিত বিষয়সমূহ মানুষকে জানিয়ে দিবেন।

এবার আসুন! আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও চিন্তা করি।

### ১. মুসা (আঃ) এর মত নবী:

মুসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যকার যেমন মিল রয়েছে অন্যান্য নবীদের মধ্যে সে রকম মিল অন্য দু'জন নবীর মধ্যে খুজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। তারা উভয়েই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। তারা প্রত্যেকেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে আশ্চর্যজনকভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন নবী ও রাষ্ট্রপ্রধান। এবং তারা প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভূমি থেকে তাদের বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে হযরত করেছেন।

ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে উপরের মত মিল নেই। এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও মিল নেই যেমন- স্বাভাবিক জন্ম, পারিবারিক জীবন এবং মুসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর মত স্বাভাবিক ইন্তেকাল বা মৃত্যু; যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) ইন্তেকালই করেননি।

মুসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতেরা তাদেরকে যেমন আল্লাহ তায়ালায় নবী মনে করেন ঈসা (আঃ) এর অনুসারীরা তাকে তেমন নবী মনে করে না বরং আল্লাহ তায়ালায়

পুত্র মনে করে।(নাউজুবিল্লাহ) তারা (মুসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতেরা) ঈসা (আঃ) কেও আল্লাহ তায়ালার নবী বলে বিশ্বাস করে।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, বাইবেলের ভবিষ্যতবাণী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে মিলে যায়; ঈসা (আঃ) এর সাথে নয়। কারণ, মুসা (আঃ) এর সাথে ঈসা (আঃ) এর তুলনায় মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাদৃশ্যই বেশী।

অপরদিকে, "গসপেল অব জন" থেকে জানা যায় যে, ইহুদীরা তিনটি স্বতন্ত্র ভবিষ্যতবাণীর অপেক্ষা করছিল। সেগুলো হল-

১. ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাব
২. ইলিয়ার (Elija) আবির্ভাব।
৩. মহানবী (সাঃ) এর আবির্ভাব।

জন দ্য বাপটিষ্ট বা ইয়াহইয়া ( আঃ) কে জিজ্ঞাসা করা তিনটি প্রশ্ন থেকেই এটা স্পষ্ট হয় যে, তারা তিনটি ভবিষ্যতবাণীর অপেক্ষা করছিল। যখন জেরুজালেমের ইহুদীরা পাদ্রীদেরকে পাঠাল এই প্রশ্ন করতে যে, কে আপনি? (তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে) তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। তাদের প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করেননি। তিনি তাদেরকে বললেন: আমি ঈসা (আঃ) নই। তারা জিজ্ঞাসা করল: তাহলে আপনি কি ইলিয়া? উত্তরে বললেন: না। তারা বলল: আপনি কি মহানবী (সাঃ)? তিনি বললেন: না। (জন:১, ১৯- ২১ পৃষ্ঠা)

যদি আমরা বাইবেলের পাতার পার্শ্ববর্তী টীকার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, সেখানে "Prophet" শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। (জন:১, ২১ পৃষ্ঠা) এই শব্দটি Deutaronomy 18 এর ১৫ ও ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ভবিষ্যতবাণীর সাথে সম্পৃক্ত। উক্ত আলোচনার পর এখন আমরা বলতে পারি যে, Deutaronomy 18 এর ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত নবী বলে ঈসা ( আঃ) কে বুঝানো হয়নি।

## ২. ঈসরাঈলীদের ভাতৃবর্গ থেকে:

ইবরাহীম( আঃ) এর ছিল দুই ছেলে ইসমাইল ও ইসহাক ( আঃ) ।(জেনেসিস- ২১) ইসমাইল (আঃ) হলেন আরবদের পূর্বপুরুষ। আর ইসহাক (আঃ) ইহুদী জাতির পূর্ব পুরুষ। আর যে নবীর ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে তিনি ইহুদীদের মধ্য থেকে আসবেন না। বরং তিনি আসবেন তাদের ভাতৃবর্গদের মধ্য থেকে তথা ইসমাইল (আঃ) এর বংশ থেকে। মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এর বংশ থেকে এসেছেন। সুতরাং, তিনিই বাইবেলে উল্লিখিত আকাংখিত নবী।

বাইবেলের "ইশঈয়া:৪২, ১- ১৩ পৃষ্ঠাতে একজন আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা (যাকে নির্বাচন করা হয়েছে) এবং রাসুল(দূত) সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তিনি

শরীয়ত তথা জীবনবিধান নিয়ে আসবেন। তিনি তা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত বা পিছপা হবেননা। দ্বীপের অধিবাসীরা তার আনীত জীবনবিধানের জন্য অপেক্ষায় থাকবেন। ("ইশ্‌ঈয়া:৪২, ৪ পৃষ্ঠা)

১১ নং উক্তি (বাক্য) রাসুল বা দূতকে "কায়দারের" বংশ থেকে আবির্ভাব হবে বলে বলা হয়েছে। জেনেসিস- ২৫:১৩ অনুসারে কায়দার হলেন- ইসমাইল (আঃ) এর দ্বিতীয় পুত্র ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বপুরুষ।

### ৩. এই নবীর মুখে তার বাণী:

আল্লাহ তায়ালা তার বাণী কুরআন মাজীদকে বাস্তবিকই তার মুখে দিয়ে দিয়েছেন। তিনি জিবরাইল (আঃ) কে পাঠিয়েছেন মুহাম্মদ (সাঃ) কে তার বাণী শিক্ষা দেবার জন্য। আর রাসুল (সাঃ) তার সাহাবীদের দিয়ে জিবরাইল (আঃ) এর কাছ থেকে যেমন শুনতেন তেমনি লিখিয়ে নিতেন। সুতরাং, কুরআনের বাণী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কথা নয়। তার নিজের চিন্তাপ্রসূত নয়। বরং, তা জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে তার মুখে রাখা হয়েছে। আর মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশাতেই এবং তার নিজের পরিচালনাতেই সাহাবীরা কুরআনকে লিপিবদ্ধ ও কণ্ঠস্থ করেছেন। অতএব, এ কথা বলা যায় যে, Deuteronomy 18 এর ১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত " আর যারা তার মুখস্থিত আমার কথা না শুনবে আমি তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করব।" এই নবী হচ্ছেন মুহাম্মদ (সাঃ)।

(বাইবেলে মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে আরও জানতে [www.islam-guide.com/mib](http://www.islam-guide.com/mib) ব্রাউজ করুন।)

### ৪. কুরআনের সংঘটিত ভবিষ্যতবাণী

কুরআনে উল্লেখিত ভবিষ্যত বাণীসমূহের মধ্যে যা পরবর্তীতে হুবহু ঘটেছে তন্মধ্যে একটি হল পারস্যদের কাছে পরাজয়ের পর ৩ থেকে ৯ বছরের মধ্যে পারস্যদের উপর রোমানদের বিজয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেন:

غَلَبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3)  
فِي بَضْعِ سِنِينَ

অর্থাৎ, রোমকরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিশিঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যে। (সুরা রুম:২- ৪)



আয়াতে উল্লেখিত আরবী শব্দ "أَدْنَى الْأَرْضِ" "আদনাল আরদ মানে হল- আরব উপদ্বীপের নিকটবর্তী স্থান।

আসুন! আমরা এই যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে একটু আলোচনা করি। History of The Byzantine State গ্রন্থে লেখক বলেন: ৬১৩ খৃষ্টাব্দে রোমান বাহিনী ইস্তাকিয়ায় অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে, পারস্য সাম্রাজ্য চারদিকে তাদের দখল পাকাপোক্ত করে নেয়।(History of The Byzantine State- Ostrogorsky, পৃষ্ঠা- ৯৫) ঐ সময় কোন লোকের পক্ষে এটা ধারণা করা রীতিমত অসম্ভব ছিল যে, রোম সাম্রাজ্য আবার পারস্যের উপর বিজয়ী হবে। তবে, কুরআন মাজীদ ভবিষ্যতবাণী করল যে, আগামী ৩ থেকে ৯ বছরের মধ্যে রোমানরা পারস্যের উপর বিজয়ী হবে। পরাজয়ের ৯ বছর পর বাস্তুবিকই ৬২২ খৃষ্টাব্দে রোমানরা পারস্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল আরমেনিয়ার ভূমিতে। যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ রোমানরা ৬১৩ খৃষ্টাব্দে পরাজয়ের পর পারস্যের উপর প্রথম বারের মত সুবিশাল বিজয় অর্জন করল। এভাবেই কুরআন মাজীদের ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হল।

এছাড়াও কুরআন শরীফে আরও অনেক আয়াত আছে ভবিষ্যতবাণী নিয়ে। রাসুল (সাঃ) এর বেশ কিছু হাদীসেও কিছু কিছু ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে যা পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছে। এগুলো সম্বন্ধে জানতে " কনভেইং ইসলামিক মেসেজ সোসাইটি " কর্তৃক প্রকাশিত "আল- মু'জিজাতুল খালিদাহ" বা চিরন্তন মু'জিজাহ বইটি দেখা যেতে পারে।

## ৫. রাসুল (সাঃ) এর কিছু মু'জিজাহ (মিরাকল)

আল্লাহ তায়ালায় ইচ্ছায় রাসুল (সাঃ) এর হাতে বেশ কিছু মু'জিজাহ বা আশ্চর্যজনক কাজ সংঘটিত হয়েছে। বহু মানুষ সেগুলোকে স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কিছু মু'জিজাহ নিম্নে বর্ণিত হল-

- যখন মক্কার মুশরিকরা রাসুল (সাঃ) এর কাছে মু'জিজাহ দেখাতে আবদার করল তখন রাসুল (সাঃ) তাদেরকে চাদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন।(বুখারী ও মুসলিম)
- আরেকটি মু'জিজাহ হল রাসুল (সাঃ) এর হাতের আংগুল থেকে পানির ধারা বয়ে যাওয়া। হাদীসটি হল:-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ

فَضْلَةٌ فَجُعِلَ فِي إِنْاءِ فَاتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ الْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرَبُوا فَجَعَلْتُ لَا أَلُوَا مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ قُلْتُ لَجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَع مِائَةٍ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً

অর্থাৎ, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন আসর নামাজের সময় আমি নিজেকে রাসুল (সাঃ) এর সাথে দেখলাম (রাসুল সা. এর সাথে ছিলাম)। অথচ, আমাদের সাথে পাত্রের মধ্যে খুবই সামান্য পানি ছাড়া আর কোন পানি ছিল না। পানিটুকুকে একটি পাত্রে রেখে রাসুল (সাঃ) এর কাছে নিয়ে আসা হল। রাসুল (সাঃ) সেই পানিতে তার হাত ঢুকিয়ে আংগুলসমূহ ছড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন: "হে অজুকারীরা (অজু করতে ইচ্ছুক) আমার দিকে এস। (এটা) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বরকত"। আমি দেখলাম রাসুল (সাঃ) এর আংগুল সমূহের মাঝখান থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সাহাবীরা সবাই অজু করলেন এবং পান করলেন। আমি সেটাকে বরকত মনে করে তার থেকে মুখ ফিরালাম না যতক্ষণ না আমার পেট পূর্ণ হয়। জাবের (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল আপনারা ঐদিন কত লোক ছিলেন? তিনি বললেন: একহাজার চার শতজন। হুসাইন ও আমর ইবনে মুররা সালেম থেকে জাবের (রাঃ) সূত্রে বলেন: এক হাজার পাচশত জন। (বুখারী শরীফ)

এ ছাড়া আরও অনেক মু'জিজা রাসুল (সাঃ) এর হাতে সংঘটিত হয়েছে। সেগুলোর কিছু জানার জন্য " কনভেইং ইসলামিক মেসেজ সোসাইটি" কর্তৃক প্রকাশিত "আল-মু'জিজাতুল খালিদাহ" বা চিরন্তন মু'জিজাহ বইটি দেখা যেতে পারে।

## ৬. মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনাড়ম্বর জীবনযাপন

আমরা যদি রাসুল (সাঃ) এর নবুওত পূর্ববর্তী জীবনের সাথে নবুওত পরবর্তী জীবনের তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, তিনি সন্মান, মর্যাদা, নেতৃত্ব বা অন্য কোন কিছু পাওয়ার লোভে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন এ কথা সুস্থ বিবেকও মেনে নেবে না।

নবুওত পাওয়ার আগে রাসুল (সাঃ) এর কোন দুঃচিন্তা বা সমস্যা ছিল না। তিনি সৎ, প্রসিদ্ধ ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে সন্তোষজনক আয় করতেন। কিন্তু, নবুওত লাভের

পর তা সাধারণ পর্যায়ের চেয়ে আরও নিচে নেমে পড়ল। বিষয়টা পরিস্কার করতে আমরা তার জীবনের একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরব।

- একটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أُخْتِي إِنَّ كُنَّا  
لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي آيَاتِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ فَقُلْتُ يَا خَالَئُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ  
قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْتَقِينَا

অর্থাৎ, হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আয়েশা রা.) তাকে বলেছেন: হে আমার ভাগিনা(বোনের ছেলে) ! আমরা নতুন চাদ দেখতাম তারপর আবার চাদ দেখতাম এভাবে দুইমাসে তিনবার নতুন চাদ দেখতাম। অথচ, রাসুল ( সাঃ) এর বাড়ীর চুলায় আগুন জ্বলে নাই। আমি বললাম: খালা! তাহলে আপনারা কিভাবে জীবন ধারণ করতেন? তিনি বললেন: দুইটি কাল দ্রব্য- পানি ও খেজুর দিয়ে। তবে, রাসুল (সাঃ) এর কিছু প্রতিবেশীর দুগ্ধবতী ছাগল বা উট ছিল তারা তার দুধ দোহন করে রাসুল (সাঃ) কে উপহার দিতেন আর রাসুল (সাঃ) তা থেকে আমাদেরকে পান করাতেন। (বুখারী শরীফ)

- অন্য হাদীসে এসেছে-

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন: রাসুল (সাঃ) ইস্তেকাল পর্যন্ত মোলায়েম রুটি দেখেছেন বলে আমার জানা নাই। (বুখারী শরীফ)

- অপর বর্ণনায় এসেছে-

قَالَتْ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ فَرَّاشَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْمًا وَحَشْوُهُ لَيْفٌ

অর্থাৎ, আয়েশা (রাঃ) বলেন: রাসুলের (সাঃ) এর বিছানা ছিল চামড়া ও খেজুর গাছের বাকলের তৈরী। (মুসনাদে আহমদ)

- আরেক রেওয়াজে এসেছে-

عن عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم  
دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها  
وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله

অর্থাৎ, আমর ইবনে হারেস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল (সাঃ) ইস্তিকালের সময় কোন দীনার, দিরহাম, দাস, দাসীর কিছুই রেখে যাননি। সাদা খচ্চর (যাতে তিনি আরোহন করতেন), তরবারী ও এক টুকরা জমীন ছাড়া যা তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছেন। (নাসায়ী শরীফ)

রাসুল (সাঃ) এরকম কঠোরভাবে জীবন যাপন করেছেন বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রের সম্পদ তার হাতে থাকার পরও। আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ লোক তার ইস্তিকালের আগেই ইসলামে প্রবেশ করেছিল এবং তার নবুওত প্রাপ্তির ১৮ বছর পর মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেছেন।

তাহলে, রাসুল (সাঃ) নবুওত দাবী করেছেন উচ্চাবিলাসিতা ও নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য এটা বলা কি সম্ভব? অথচ, নেতৃত্ব ও উচ্চাবিলাসিতার সাথে স্বাভাবিকভাবেই ভাল ভাল খাবার- দাবার, উন্নত পোশাক ও সুউচ্চ অট্টালিকা ও পাহারাদার বর্তমান থাকার কথা। মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে এগুলোর কোনটিই বা ছিল?

এর উত্তরে আসুন, আমরা তার জীবনের সুন্দর একটা চিত্রে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিই। আল্লাহর নবী, শিক্ষক, রাষ্ট্রনায়ক ও বিচারক হওয়া সত্ত্বেও রাসুল (সাঃ) বকরীর দুধ দোহন করতেন। নিজের পোশাক নিজেই সেলাই করতেন। নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন। বাড়ীর গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা করতেন। গরীব অসুস্থদেরকে সেবা সশ্রম্বা করতেন। এছাড়া তার সাহাবীদেরকে বালি সরিয়ে খন্দক বা খাল খননে সহযোগিতা করতেন। মোটকথা, তার জীবনটা ছিল বিনয় ও নম্রতার একটা উজ্জ্বল আদর্শ। (মুসনাদে আহমদ ও সহীহ বুখারী)

রাসুল (সাঃ) কে সাহাবীগণ অত্যন্ত ভালবাসতেন, সন্মান করতেন এবং তার উপর এত আস্থা পোষণ করতেন যে, রীতিমত আশ্চর্য হতে হয়। অথচ, তিনি সর্বদা গুরুত্বারোপ করে বলতেন যে, ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হকদার আল্লাহ তায়ালা; তিনি নন। রাসুল (সাঃ) এর সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) বলেন: রাসুল (সাঃ) এর সাহাবীরা রাসুল (সাঃ) থেকে অন্য কাউকে বেশী ভালবাসতেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি যখন তাদের

কাছে আসতেন তখন তারা দাড়াতে না। কারণ, রাসুল ( সাঃ) তার জন্য কেউ দভায়মান হোক তা অপছন্দ করতেন যেমনটি অন্যান্য জাতির লোকেরা বড় ধরণের লোকের জন্য করে থাকে।( এই ভাবার্থে মুসনাদে আহমাদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে)

ইসলামের উজ্জ্বল জোতি পুরোপুরি প্রকাশিত হওয়া এবং তার উপর সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতনের আগে রাসুল ( সাঃ) ও তার সাহাবীদের কাছে কাফেরদের পক্ষ থেকে " উতবা" নামক একজন প্রতিনিধি এসে তাকে বলল: " যদি আপনি যে দায়িত্ব ( নবুওত) নিয়ে এসেছেন তার বিনিময়ে সম্পদ চান তাহলে, আমরা আমাদের সম্পদ সম্পত্তি জমা করে আপনাকে দিয়ে দেব। ফলে আপনি আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবেন। যদি আপনি এর দ্বারা সন্মান কামনা করেন, তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে দেব। আপনার নির্দেশ ব্যতিত আমরা কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। আর যদি রাজত্ব চান তাহলে, আমাদের উপর আপনাকে বাদশাহ বানিয়ে দেব।.....

এতগুলো বিষয়ের বিনিময়ে তার কাছে করা হয়েছে একটিমাত্র দাবী। আর তাহল- মানুষকে ইসলাম ও অংশীদার বিহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত দেয়া থেকে ক্ষান্ত হওয়া। যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসে থাকে লালায়িত তাদের জন্য কি এটা মোক্ষম সুযোগ ছিল না? রাসুল ( সাঃ) কি মুশরিকদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য টালবাহানা করেছিলেন? রাসুল ( সাঃ) কি এর চেয়ে আরো বেশী লাভ পাওয়ার জন্য কৌশলে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন?

কক্ষনো নয়। বরং, তার জবাব ছিল- " بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ " অতঃপর উৎবার সামনে কুরআনের সুরা হা- মীম সাজদাহর প্রথম চার আয়াত তেলাওয়াত করলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড)

আল্লাহ বলেন:

حَم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيٰتُهُ قُرْآنًا  
عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ  
(4)

অর্থাৎ, হা- মীম। এটা অবতীর্ণ হয়েছে পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। এটা নাযিল হয়েছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শোনে না। (সুরা হা- মীম সাজদাহ: ১- ৪)

অন্যস্থানে তার নিজ চাচার আবেদনে তিনি বলেছিলেন: "চাচা! আল্লাহর কসম! তারা যদি আমার ডানহাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয় তবুও আমি এ কাজ (মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া) থেকে বিরত হব না যতক্ষণ না আল্লাহ একে বিজয়ী করে অন্যগুলোকে মুলোৎপাটিত করে দেন।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড)

রাসুল (সাঃ) ও তার সাহাবীদের উপর সুদীর্ঘ ১৩ বছর ধরে অত্যাচার নির্যাতন করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং, তারা বেশ কয়েকবার রাসুল (সাঃ) কে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। একবার তারা তাকে উপর থেকে একটি বিশালাকায় পাথর নিক্ষেপে হত্যার চেষ্টা করেছে। যাতে তা তার মাথার উপর পড়ে তাকে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় করে দেয়। আরেকবার তাকে হত্যা করার মানসে দাওয়াত দিয়ে তার খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাকে খেতে দেয়া হয়।( সীরাতে ইবনে হিশাম)

শত্রুদের উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভের পরও রাসুল (সাঃ) এর জীবনের উপর এত অত্যাচার- নির্যাতন ও ত্যাগ- তিতীক্ষা থাকা কি প্রমাণ করে? তার সুউচ্চ সন্মান ও বিজয়লাভের সময়কার বিনয় ও মহত্ত্বের ব্যাখ্যা কিভাবে বর্ণনা করা সম্ভব? তার সফলতা অর্জিত হত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে; তার নিজস্ব আভিজাত্যের কারণে নয়। এমন বৈশিষ্ট্য কি এমন লোকের ভিতর থাকা সম্ভব যে পদলোভী ও স্বার্থপর?!

« اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم  
وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت  
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد »

## ৭. ইসলামের বিস্ময়কর বিস্তৃতিলাভ

এ অধ্যায়ের শেষে এমন কিছু বিষয়ের দিকে ইংগিত করাও যুক্তিযুক্ত যা ইসলামের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, আমেরিকা সহ সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশী সম্প্রসারিত ধর্মের নাম ইসলাম। এই আশ্চর্যজনক সংবাদের সামান্য জরীপ নিম্নে বর্ণিত হল।

- ইসলাম আমেরিকায় খুব দ্রুত সম্প্রসারণকারী ধর্ম। সেটা আমাদের দেশের অনেক লোকের পথনির্দেশক ও স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি।- হিলারী রোধাম ক্লিন্টন। ( Larry B. Stammer, los Angeles Times, 31 may 1994, p.3)
- মুসলমানরা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একটি সম্প্রদায়।- পপুলেশন রেফারেন্স বুরো। (Timothy Kenny, USA Today, 17 February, 1989, p.4a)
- এই দেশে ইসলাম অতি দ্রুত সম্প্রসারণ কারী ধর্ম।- জেরাল্ডিন বাউম। (Geraldine Baum, News day, 7 march 1989,P.4)
- ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত সম্প্রসারণকারী ধর্ম।- এ্যারি এল. গোল্ডম্যান (Ari. L. Goldman, New york Times, 21 February 1989, P.1)

এই আশ্চর্যজনক সম্প্রসারণ ইসলামের সত্যতারই প্রমাণ বহন করে। আমেরিকাসহ সারা বিশ্বের অসংখ্য লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে দলে দলে অবস্থান গ্রহণ করছেন। তারা চিন্তা- ভাবনা না করেই ইসলামকে সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দ্বীন বলে মেনে নিচ্ছেন এটা কল্পনাও করা যায় না। এ নও মুসলিমদের দেশ, পরিবেশ, কৃষ্টি- কালচার ও সামাজিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। তাদের মধ্যে রয়েছেন- বিজ্ঞানী, শিক্ষক, দার্শনিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অভিনেতা ও খেলোয়াড় প্রভৃতি।

উপরোক্ত প্রমাণাদি এ বিশ্বাসকে পাকাপোক্ত করে যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহ তায়ালায় বাণী, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে সত্য নবী ও রাসুল এবং ইসলাম আল্লাহ তায়ালায় সত্য দ্বীন বা ধর্ম।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের প্রচুর কল্যান নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামের খাতিরে ব্যক্তি যে সমস্ত কল্যাণ ও ফায়দা লাভ করে তা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইত্যাদি।

### ১. চিরন্তন জান্নাতের পথ:

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেন:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

অর্থাৎ, হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে আপনি এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন যার নিচ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহমান থাকবে। (সূরা বাকারা:২৫)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

অর্থাৎ, তোমরা সামনে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য।(সূরা হাদীদ:২১)

রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে বলেছেন:

إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا  
رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُورًا فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا  
فِيخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى فَيَقُولُ  
اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيَخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا



## رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا-

অর্থাৎ, আমি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জানি যে সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার অনুমতি পাবে এবং সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ঐ ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুখের উপর ভর করা অবস্থায় (উপুড় হয়ে) বের হবে। আল্লাহ তায়ালা বলবেন: যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতের কাছে এসে মনে করবে জান্নাত ভর্তি হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে: হে আল্লাহ! জান্নাতকে দেখলাম ভর্তি হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বলবেন: যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে আবার জান্নাতের কাছে এসে মনে করবে যে, জান্নাত ভর্তি হয়ে গেছে। ফিরে এসে পুনরায় বলবে- আল্লাহ! জান্নাতকে দেখলাম ভরপুর হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা এবার বলবেন: যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য সেখানে রয়েছে দুনিয়া ও তার দশগুণ পরিমাণ স্থান। (বুখারী শরীফ)

রাসুল (সাঃ) আরো বলেন:

غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ  
أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা রাস্তায় এক সকাল অথবা এক সন্ধ্যা কাটানো দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা হতে উত্তম। আর জান্নাতের মধ্যকার তোমাদের কারো ধনুক বা পা রাখার সমপরিমাণ স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। (বুখারী শরীফ)

রাসুল (সাঃ) বলেন: আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ  
عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

অর্থাৎ, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জান্নাতকে প্রস্তুত করে রেখেছি যাকে কোন চোখ দেখেনি। কোন কান (যথার্থ) শোনেনি এবং কোন অন্তর কল্পনাও করতে পারেনি। (বুখারী শরীফ)

রাসুল (সাঃ) অন্য বর্ণণায় বলেন:

يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ  
فَيَقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا  
وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ

অর্থাৎ, দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জান্নাতী ব্যক্তিকে বেহেশত থেকে ঘুরিয়ে এনে  
জিজ্ঞাসা করা হবে- হে আদম সন্তান! তুমি কি দুনিয়াতে কখনো দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন  
হয়েছিলে? তোমার উপর দিয়ে কি কোন কঠিন পর্যায় অতিক্রম করেছ? সে বলবে: না।  
হে আল্লাহ! দুনিয়াতে আমার উপর কখনও দুঃখ-দুর্দশা আসেনি। এবং আমি কোন কঠিন  
পর্যায়কে অবলোকন করিনি। (মুসলিম শরীফ)

যখন আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন সেখানে অত্যন্ত সুখে ও শান্তিতে বসবাস করবেন।  
কোন রোগ- বলাই, যন্ত্রণা, চিন্তা অথবা মৃত্যু সেখানে থাকবে না। আপনার উপরে থাকবে  
আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। আপনি সেখানে হবেন চিরস্থায়ী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا  
(57)

অর্থাৎ, আর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে আমি তাদেরকে এমন জান্নাতে  
প্রবেশ করা যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহমান থাকবে। তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ী।  
তাদের সাথে থাকবে পবিত্র সংগিনী। আমি তাদেরকে সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করাব।  
(সূরা নিসা:৫৭)

(জান্নাত ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে [www.islam-guide.com/hereafter](http://www.islam-guide.com/hereafter) ব্রাউজ করতে পারেন।)

## ২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ  
ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কুফরী অবস্থায় মারা গেছে তারা যদি আজাবের বিনিময়ে সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও দেয় তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (সূরা আলে ইমরান: ৯১)

অতএব, জাহান্নাম থেকে মুক্ত হওয়া ও জান্নাতে প্রবেশ করার এটাই (ইসলাম) একমাত্র সুযোগ। কারণ, কোন ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মারা গেলে দুনিয়ায় এসে ঈমান আনার কোন পথ খোলা থাকবেনা। কিয়ামতের দিন কাফেরের কি পরিস্থিতি হবে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে তা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبِّنَا  
وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27)

অর্থাৎ, আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোষখের উপর দাড়া করানো হবে। তারা বলবে: কতই না ভালো হত, যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হতাম; তাহলে, আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।(সূরা আনয়াম:২৭)

দ্বিতীয়বার তাদের কাউকে আর তাওবার জন্য ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেন:

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً  
ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا  
وَاللَّهِ يَا رَبِّ.

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী দোষখী ব্যক্তিকে দোষখ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করবেন: হে আদম সন্তান! তুমি কি দুনিয়ায় কখনও সুখ- শান্তির দেখা পেয়েছ? তোমার কাছে কি কখনও সুখের সময় এসেছে? সে বলবে: না, হে আল্লাহ ! আমি সুখ স্বাচ্ছন্দ্রের দেখা পাইনি।( মুসলিম শরীফ)

### ৩. আসল সুখ ও আত্মিক শান্তি:

আমরা আল্লাহ তায়ালা আদেশ নিষেধ মেনে দুনিয়াতে সৌভাগ্য ও আত্মিক শান্তি নিশ্চিত করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। (সূরা রা'দ: ২৮)

অপরদিকে যারা আল্লাহ তায়ালায় কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় দুনিয়ায় তাদের জীবন কষ্টকময় হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
أَعْمَى (124)

অর্থাৎ, আর যে আমার জিকির (স্মরণ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন নির্বাহের পথ সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। (সূরা তাহা: ১২৪)

এখান থেকেই আয়াতের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেন কিছু কিছু মানুষ প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েও প্রকৃত শান্তি না পেয়ে আত্মহত্যা করে? উদাহরণস্বরূপ- (Cat Stevens) মুসলমান হয়ে ইউসুফ ইসলাম নাম ধারণ করেছেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পোপ সংগীত শিল্পী। তার এক রাতের আয়ের পরিমাণই ছিল একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর সত্যিকার শান্তিলাভ করেছেন যা তিনি অর্থের প্রাচুর্যতা সত্ত্বেও লাভ করতে পারেন নি।

(আপনি নও মুসলিমদের ঘটনা পড়তে <http://www.islam-guide.com/stories> ব্রাউজ করতে পারেন) অথবা, " কেন আমাদের একমাত্র পছন্দ ইসলাম" ( Why Islam is our Only Choice) বইটি পড়তে পারেন। এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ও উক্ত বইয়ে আপনি পাবেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পেশার নও মুসলিমদের চিন্তা- ভাবনা ও অনুভূতি। যারা বিভিন্নজন বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব। যাদের কৃষ্টি- কালচার ও ভিন্ন ভিন্ন।

#### ৪. সত্যিকার তাওবা দ্বারা বিগত জীবনের গুনাহ ক্ষমা

কেউ যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আল্লাহ তায়ালা তার বিগত জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেন। হাদীসে এসেছে-

يروى أن عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قال:  
 قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلَأُبَايِعَكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ  
 فَقبَضْتُ يَدِي. قَالَ « مَا لَكَ يَا عَمْرُو ». قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ.  
 قَالَ « تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ». قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ  
 الْإِسْلَامَ يَهْدُمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ—

অর্থাৎ, বর্ণিত আছে- হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর কাছে আসলেন।  
 তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাঃ) কে বললাম: আপনার হাত প্রসারিত করুন আমি  
 আপনার হাতে বায়'আত হব। তিনি তার হাত সম্প্রসারণ করলেন। আমি আমার হাত  
 গুটিয়ে নিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কি হয়েছে হে আমর? আমি বললাম:  
 আমি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন: কি শর্ত করতে চাও? আমি জবাব দিলাম: আমাকে  
 যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। রাসূল (সাঃ) বললেন: তুমি কি জাননা যে, ইসলাম তার  
 পূর্বেকার সবকিছুকে (গুনাহ) ধ্বংস করে দেয়? (মুসলিম শরীফ)

## তৃতীয় অধ্যায় ইসলাম সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান

### ■ ইসলাম কি?

ইসলাম হল তুমি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাযিলকৃত বিধানকে মেনে চলবে।.....

### ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস:

#### ১. আল্লাহর উপর ঈমান

একজন মুসলিম একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। যার কোন সন্তান- সন্ততি ও অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নন। নিশ্চয় তিনিই সত্য প্রভু। তিনি ছাড়া আর অন্য যাদেরকে মানুষ ইবাদাত করে সবই মিথ্যা। আল্লাহ তায়ালার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে। তার প্রভুত্ব ও গুণাবলীতে কারো কোন অংশীদারিত্ব নেই। মহাগ্রন্থ আল- কুরআনে আল্লাহ তায়ালার নিজেই নিজের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহ বলেন:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ  
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

অর্থাৎ, হে নবী (সাঃ)! আপনি বলুন আল্লাহ তায়ালার এক ও একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। (সুরা ইখলাস)

আল্লাহ তায়ালার ছাড়া অন্য কারও কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করা বা কোন ধরণের উপাসনা করা যাবে না। বরং, এ সবকিছুরই হকদার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার।



আল্লাহ তায়ালার একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক। তিনি সৃষ্টিকর্তা, শাসনকর্তা এবং চিরঞ্জীব। তিনি সব কিছুকে পরিচালনা করেন। তিনি তার সৃষ্টির কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। বরং,

তার সৃষ্টির সবাই তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনে তার উপর নির্ভর করে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্ববিজ্ঞ। গোপণ, প্রকাশ্য, বিশেষ বা সাধারণ সবকিছুই তার নিরবচ্ছিন্ন নজরদারীতে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা জানেন যা হয়েছে, হবে এবং তা কিভাবে হবে। পৃথিবীর কোন কিছুই তার অনুমতি ছাড়া হয় না। তিনি যা চান তা হয় আর যা চান না তা হয় না। তার ইচ্ছা সমস্ত সৃষ্টির ইচ্ছার উপরে। তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান; সর্বশক্তিমান। তিনি পরম দয়ালু সর্বাধিক উপকারী। একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন সন্তানের উপর তার মাতৃস্নেহ যেমন প্রবল আল্লাহ তায়ালা তার থেকেও অনেক বেশী ভালবাসেন তার বান্দাকে। (মুসলিম শরীফ: ২৭৫৪ নং হাদীস) আল্লাহ তায়ালা জুলুম ও সীমালংঘন থেকে মুক্ত। তিনি তার সমস্ত কাজ ও নির্দেশে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান। কেউ যখন আল্লাহ তায়ালায় কাছে কিছু চাওয়ার ইচ্ছা করে সরাসরি চাইতে পারে কারো মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না।

আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ) তথা যীশু নন। যীশু ও আল্লাহ নন। (১৯৮৪ সালের ২৫ শে জুন লন্ডনের এসোসিয়েশন প্রেস সুত্রে প্রকাশ- ইংল্যান্ডের অধিকাংশ খৃষ্টান বিশপ বলেন: যীশুখৃষ্টকে স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করা জরুরী নয়। ইংল্যান্ডের ৩৯ জন বিশপের মধ্যকার ৩১ জনের মতই এটা। আর উক্ত ৩১ জন বিশপের মধ্যকার ১৯ জন বলেন: যীশু খৃষ্টকে আল্লাহ তায়ালায় সর্বোচ্চ প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট।) বরং, ঈসা (আঃ) নিজেই নিজেকে স্রষ্টা হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72)

অর্থাৎ, যারা বলে মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ) ই আল্লাহ তারা কাফের। অথচ, ঈসা (আঃ) বলেছেন- হে বনী ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় সাথে অংশীদার স্থাপন করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোনই সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়েদাহ: ৭২ আয়াত)

আল্লাহ তিনজন নন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ

## مَرِيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ بُيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75)

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা কাফের যারা বলে- আল্লাহ তিনের এক; অথচ, এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারা যদি স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে, তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিপতিত হবে। তারা আল্লাহর কাছে কেন তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে না?! আল্লাহ তায়ালা যে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ) রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তার পূর্বে অনেক রাসূল অতীত হয়েছেন আর তার মাতা একজন ওলী। তারা উভয়েই খাদ্য খেতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্য কিরূপ যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করি। আবার দেখুন, তারা উলটা কোন দিকে যাচ্ছে। (সূরা মায়েরাঃ: ৭৩- ৭৫)

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন একথা বিশ্বাস করা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। তিনি তার কোন ফেরেশতার সাথে কুস্তি করেছেন, তিনি মানবজাতির উপর হিংসা করেছেন বা তিনি কোন মানুষের ভিতরে মানুষের আকৃতিতে আছেন এ সব ধারণাও ইসলাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। এ ছাড়া ইসলাম মানুষের কোন আকৃতির সাথে আল্লাহ তায়ালা সম্পৃক্ততাকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা, এগুলো সবই কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুরই উর্ধে। তিনি যে কোন প্রকার অপূর্ণাংগতা থেকে মুক্ত ও দূরে। আল্লাহ তায়ালা ক্লান্ত হননা এবং তাকে নিদ্রা বা তন্দ্রা স্পর্শ করে না।

আরবী শব্দ (اللَّهِ) এর অর্থ হচ্ছে- প্রতিপালক, একক স্রষ্টা যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। (اللَّهِ) শব্দটি স্রষ্টা অর্থে আরব মুসলমান ও খৃষ্টানগণ ব্যবহার করে থাকে। একক স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কোন অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। এ শব্দটি কুরআন শরীফে ২১৫০ বারের ও বেশীবার ব্যবহার করা হয়েছে। ঈসা (আঃ) এর ভাষা (তিনি সাধারণত এই ভাষায় কথাবার্তা বলতেন) আরামীয় ভাষায় (আরবী ভাষার সাথে গভীর সম্পর্কশীল ভাষা) إِلَهٍ (اللَّهِ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

### ২. ফেরেশতাদের উপর ঈমান

মুসলমানরা ফেরেশতাদের সম্বন্ধে বিশ্বাস করেন যে, তারা আল্লাহ তায়ালা এক সন্মানিত সৃষ্টি। তারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ইবাদাত করেন। আল্লাহ তায়ালা অনুগত্য করেন এবং তার আদেশ ছাড়া কোন কাজ করেন না। ফেরেশতাদের মধ্যকার জিবরাইল (আঃ) রাসূল (সাঃ) এর কাছে ওহী (কুরআন) নিয়ে আসতেন।



### ৩. আসমানী কিতাবের উপর ঈমান

মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তায়ালা তার রাসুলদের উপর ওহী হিসেবে আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন ও মানুষের জন্য সত্য দ্বীনের প্রমাণ হিসেবে। এই আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অন্যতম যা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে হেফাজতের দায়িত্ব নিজ কাধে তুলে নিয়েছেন। যেন এর মাঝে কোন পরিবর্তন ও বিকৃতি না ঘটে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি এই কুরআনকে নাযিল করেছি আর আমিই এর হেফাজতকারী।  
(সূরা হিজর:৯ আয়াত)

### ৪. নবী-রাসুলদের উপর ঈমান

মুসলমানগণ আদম (আঃ) থেকে শুরু করে নুহ, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব, ও ঈসা (আঃ) প্রমুখ নবীদের উপর বিশ্বাস করেন। তারা বিশ্বাস করেন চিরন্তন ও শেষ রিসালাত (আসমানী কিতাব) মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাযিল হয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তায়ালা প্রেরিত শেষ নবী ও রাসুল। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ  
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40)

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের কোন (প্রাপ্ত বয়স্ক)ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। (সূরা আহযাব:৪০)

মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন- সমস্ত নবী আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ। এই সমস্ত নবীর কারও ভিতরে স্রষ্টা তথা আল্লাহ তায়ালা কোন বৈশিষ্ট্য নেই।...

### ৫. শেষ দিবসের উপর ঈমান

মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, শেষ দিবসে (পুনরুত্থিত হওয়ার দিন) সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকাণ্ড ও বিশ্বাসের হিসাব নিকাশ নিবেন।

### ৬. তাকদীরের উপর ঈমান

মুসলমানরা তাকদীরের উপর বিশ্বাস করে। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, মানুষদেরকে তাদের কাজ-কর্মে স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। বরং, মুসলমানরা তাদের কাজে আল্লাহ তায়ালা স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে মনে করে। অর্থাৎ, তাদের স্বাধীনতা আছে ভাল ও মন্দ থেকে বেছে নেয়ার। তারা ভালো-মন্দ থেকে একটি নির্বাচন করার দায়-দায়িত্ব বহন করবে। তাকদীরের উপর বিশ্বাস চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেগুলো হল-

- আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই জানেন। অর্থাৎ, তিনি জানেন কি হয়েছে এবং আগামীতে কি হবে।
- আল্লাহ তায়ালা যা কিছু হয়েছে বা হবে সবকিছুকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।
- আল্লাহ যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয় না।
- আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

(ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে [www.islam-guide.com/beliefs](http://www.islam-guide.com/beliefs) ব্রাউজ করতে পারেন।)

### ■ কুরআন ব্যতীত ইসলামের অন্য কোন উৎস আছে কি?

হ্যাঁ, রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ বা হাদীস (রাসূল সা. এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি) ইসলামের দ্বিতীয় উৎস। আর সুন্নাহ বা হাদীস হল আমানতদারীতা ও বিশ্বস্ত সূত্রে সাহাবীদের থেকে সংকলিত রাসূল (সাঃ) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি। সুন্নাহ বা হাদীসের উপর বিশ্বাস করা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

- রাসূল (সাঃ) এর কিছু হাদীস:

« مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى »

অর্থাৎ, মু'মিনদের পরস্পরিক দয়া, সহমর্মিতা ও হৃদয়তার দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যখন তার মধ্যকার কোন অংগ আক্রান্ত হয় তাতে সমস্ত শরীর আক্রান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

\* أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خَلْقًا

অর্থাৎ, মু'মিনদের মধ্যে সেই লোকই পূর্ণাংগ ঈমানদার। যার স্বভাব-চরিত্র সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীদের নিকট উত্তম। (তিরমীজি ও মুসনাদে আহমদ)

\* لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণাংগ) মু'মিন হতে পারবে না; যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

\* الرَّاحُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُوا مِنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكَ مِنْ فِي السَّمَاءِ

অর্থাৎ, যারা দয়া করে পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সদয় হন। তোমরা দুনিয়ায় যারা আছে তাদের প্রতি সদয় হও; বিনিময়ে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হবেন। (তিরমীজি শরীফ)

**\* تبسمك في وجه أخيك لك صدقة**

অর্থাৎ, মুসলমান ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকী হাসি সাদকাহ হিসেবে গণ্য হবে। (তিরমীজি শরীফ)

**\* الكلمة الطيبة صدقة**

অর্থাৎ, উত্তম কথাবার্তাও সাদকাহ হিসেবে গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

**\* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ**

অর্থাৎ, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

**\* إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ**

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চেহারা-সুরত ও ধন-সম্পদের দিকে তাকাবেন না। বরং, তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ ও কর্মকে দেখবেন। (মুসলিম শরীফ)

**\* أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه**

অর্থাৎ, তোমরা শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা দিয়ে দাও তার শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই। (ইবনে মাজাহ)

**بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبئرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لِأَجْرًا فَقَالَ « فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ »**

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাটতেছিল। পিপাসা লাগলে সে একটি কুপে নেমে পানি পান করে পিপাসা মেটাল। সেখান থেকে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর হাপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কর্দমাক্ত মাটি চাটছে। লোকটি বললেন: পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল তারও ঠিক একই পরিণতি হয়েছে। সে কুপের ভিতরে নেমে নিজের মোজা ভর্তি করে পানি তুলে এনে কুকুরের সামনে ধরল। কুকুরটি পানি পান করে জীবন ফিরে পেল। লোকটি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। ফলে, আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ! জন্তকে পানি পান করানো বা তার সাথে ভাল ব্যবহার করায়ও কি সাওয়াব আছে? রাসূল (সাঃ) বললেন: প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীতেই সাওয়াব আছে। (বুখারী ও মুসলিম)...

### ■ কিয়ামতের দিন সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, ইহকালীন জীবন পরকালীন জীবনের একটি প্রস্তুতি। দুনিয়ার এ জীবন আখেরাতের জীবনের পরীক্ষাকেন্দ্র। বিশ্বজগত ধ্বংসের পরে এই দিনটি আগমন করবে। মৃতব্যক্তিদেরকে আল্লাহর সামনে হিসাব- নিকাশের জন্য উত্থিত করা হবে। এ দিনটি হবে একটি নতুন জীবনের শুরু যার কোন শেষ নেই। এ দিনকেই বলা হয় কিয়ামতের দিন।

প্রত্যেক মানুষ তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস ও কর্মফলের মুখোমুখি হবে। যারা " لا إِلَهَ إِلَّا " (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ) তে বিশ্বাস করে

মারা গেছে তারা মুসলমান। তারা তাদের কর্মফল হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ (82)

অর্থাৎ, আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তারা হবে জান্নাতী। সেখানে তারা চিরস্থায়ী অবস্থান করবে। (সূরা বাকারা: ৮২)

আর যারা " لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ " (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ) তে বিশ্বাস স্থাপন না করে মারা যাবে তারা মুসলমান বলে গণ্য হবে না। তারা চিরদিনের জন্য জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
(85)

অর্থাৎ, আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুকে ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে তা কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা আলে ইমরান:৮৫)

তিনি আরও বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ  
ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91)

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কুফরী অবস্থায় মারা গেছে তারা যদি আজাবের বিনিময়ে সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও দেয় তবুও তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (সুরা আলে ইমরান: ৯১)

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে- আমি ধারণা করি যে, ইসলাম উত্তম ধর্ম; আমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি তাহলে, পরিবার- পরিজন, বন্ধুবান্ধব, ও অন্যান্য লোকেরা আমার উপর অত্যাচার নির্যাতন ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে। তাহলে, আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি দোষখ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে- আমরা পবিত্র কুরআন মাজীদে দেখতে পাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
(85)

অর্থাৎ, আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুকে ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে তা কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা আলে ইমরান:৮৫)

আল্লাহ তায়ালা রাসুল হিসেবে মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রেরণ করার পরে কেউ নিজেকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততা দেখালে আল্লাহ তায়ালা তা গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, ও অভিভাবক। তিনি দুনিয়ার সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের যতসব কল্যাণ, দয়া- মায়া, মমতা সবকিছুই তার কাছ থেকে

এসেছে। এসবের পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে না এবং তার মনোনীত ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে মেনে নেবে না তাকে পরকালে শাস্তি দেয়াই ন্যায়পরায়ণতার কাজ। তবে, ইহকালে আমাদেরকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একক সত্ত্বা আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত বা আনুগত্য করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

অর্থাৎ, আমি মানুষ ও জ্বীনজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাতের জন্য। (সুরা যারিয়াত: ৫৬)

আমরা যেখানে বসবাস করছি তা খুবই সংক্ষিপ্ত জীবন। কিয়ামতের দিনে কাফেররা বিশ্বাস করবে যে, তারা দুনিয়ায় বসবাস করেছে শুধুমাত্র একদিন বা তার কিছু অংশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ (113)

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা বলবেন: তোমরা বছরের গণনায় পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে- আমরা একদিন বা তার কিছু অংশ পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলাম। অতএব, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। (সুরা মু'মিনুন: ১১২- ১১৩)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116)

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অযথাই সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার দরবারে ফিরে আসতে হবে না? অতএব, শীর্ষ মহিয়ান আল্লাহ তায়ালা তিনিই সত্যিকার মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি সন্মানিত আরশের মালিক। (সুরা মু'মিনুন: ১১৫- ১১৬)

পরকালের জীবনই আসল জীবন। সেটা শুধুমাত্র আত্মার জীবনই নয় বরং, তা শারিরিক জীবনও। আমরা সেখানে বসবাস করব আমাদের আত্মা ও শরীর উভয়টি নিয়েই। দুনিয়ার জীবনের সাথে আখেরাতের জীবনের তুলনা করতে গিয়ে রাসুল (সাঃ) বলেছেন-

وَاللَّهُ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ

অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! কোন ব্যক্তি তার আঙ্গুলকে সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়ার পর (আঙ্গুল সরিয়ে নিলে) তার কাছে সমুদ্রের তুলনায় যতটুকু অংশ (পানি) আসে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া তেমনই। (মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

এমনিভাবে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের মূল্য অথৈ সমুদ্রের তুলনায় কয়েক ফোটা পানির সমান ছাড়া আর কিছুই নয়।...

## ■ ইসলাম গ্রহণের নিয়ম

কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র " لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ) বলার দ্বারা অমুসলিম থেকে মুসলিমে পরিণত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করে।

এই বাক্যের প্রথম শব্দের অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই। একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাসনা পাওয়ার দাবি করতে পারে না। তার কোন অংশীদার বা সন্তান- সন্ততি নেই।

মুসলমান হতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই-

ক. মহাগ্রন্থ আল- কুরআনকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক অবতীর্ণ আক্ষরিক ওহী হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

খ. কিয়ামতের দিন বা পুনরুত্থান দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদার ফলশ্রুতি হিসেবে অবশ্যই সে দিন উপস্থিত হবে।

গ. ইসলামকে দীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।

ঘ. একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত অন্য কারো ইবাদত বা উপাসনা করবে না।

রাসুল ( সাঃ) বলেন:

لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ  
بَأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجْرَةً  
فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا  
قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَاخَذَ بِخَطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي  
وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ «

অর্থাৎ, কোন বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশি হন যে, মরুভূমিতে সফরে ছিল। অতঃপর বাহন তার পিঠের উপরে রক্ষিত খাদ্য ও পানীয় নিয়ে পালিয়ে গেল। সে ব্যাপকভাবে খুজাখুজি করে না পেয়ে নিরাশ হয়ে গাছের নিচে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় ( ঘুম থেকে জেগে) দেখল তার সওয়ারী তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সে তার লাগাম ধরে অত্যন্ত খুশি হয়ে বলল: হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার রাব্ব বা প্রতিপালক। অত্যন্ত খুশি হয়ে সে ভুল করে বসল। ( মুসলিম শরীফ)



বিল্ডিংয়ের প্রবেশ পথে লেখা রয়েছে (لا إله إلا الله محمد رسول الله)

## ■ কুরআন মাজীদের আলোচ্যবিষয়

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। একজন মুসলিমের যাবতীয় বিশ্বাস ও কাজকর্মের উৎস। মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই তাতে আলোকপাত করা হয়েছে। তাতে রয়েছে শিক্ষা, ইবাদাত, আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন বিষয়ের বিধানাবলী ও হিকমাত অবলম্বন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়।



তবে এর মৌলিক বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক। তা একই সময়ে মুসলমানকে সুষ্ঠু সমাজ গঠন, মানুষের সার্বিক পথচলা এবং স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক দিক- নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।



উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদ শুধুমাত্র আরবী ভাষায় মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাযিলকৃত ওহীর নাম। অতএব, ইংরেজী সহ যে কোন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ "কুরআন" নয় এবং তা পাঠ করাও কুরআন তেলাওয়াত বলে গণ্য হবে না। বরং, সেগুলো কুরআন মাজীদের অর্থের অনুবাদ। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত ওহী ছাড়া অন্য কোন কুরআন নেই।

## ■ মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরিচয়

মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের আগেই তার পিতা এবং ছেলেবেলায় মাতা মারা যান। প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশে তার চাচা তাকে দেখাশোনা করেন। রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) নিরক্ষর অবস্থায় বেড়ে ওঠেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। এভাবেই (নিরক্ষর) তিনি জীবন সন্ধিক্ষনে উপনীত হন। নবুওয়াত লাভের আগে তার বংশের লোকেরা শিক্ষা থেকে দূরে ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। মুহাম্মদ (সাঃ) আস্তে আস্তে বেড়ে উঠলে তিনি সত্যবাদী, একনিষ্ঠ, দয়ালু ও বিশ্বস্ত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমানতদারীতায় তার অবস্থান এত উপরে উঠে গেল যে, লোকেরা তাকে "আল-আমীন" তথা বিশ্বাসী উপাধীতে ভূষিত করল। রাসুল (সাঃ) অত্যন্ত উচ্চ মাপের ধার্মিক ছিলেন। বংশীয় লোকদের পৌত্তলিকতা ও কঠোর মনোভাবাপন্ন অবস্থাকে তিনি অপছন্দ করতেন।

রাসুল (সাঃ) যখন চল্লিশতম বছরে পদার্পন করলেন তখন জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম ওহী প্রাপ্ত হলেন। এভাবে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তার নিকট ওহী আসার মাধ্যমে কুরআন নাযিল সম্পন্ন হল। রাসুল (সাঃ) যখন তার উপর নাযিলকৃত কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখন তিনি এবং তার সাথে থাকা সাহাবীদের ছোট্ট একটি গ্রুপ কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হন। ক্রমান্বয়ে এ অত্যাচারের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। শেষপর্যন্ত ৬২২ খৃষ্টাব্দে আল্লাহ তায়ালা তাকে হিজরত তথা দেশত্যাগ করার নির্দেশ দেন। মক্কা থেকে ২৬০ কিলোমিটার উত্তরে মদীনায়া তার হিজরত ইসলামী ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জির শুরু হিসেবে ধর্তব্য হয়। এর কয়েকবছর পর রাসুল (সাঃ) ও তার সাহাবীরা মক্কায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। তারা সেখানে এসে শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দেন। ৬৩ বছর বয়সে রাসুল (সাঃ) এর ইন্তেকালের আগে আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করে। তার ইন্তেকালের পরবর্তী মাত্র কয়েকশত বছরে পূর্বদিকে চীন থেকে শুরু করে পশ্চিমদিকের স্পেন পর্যন্ত ইসলাম দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত ইসলামের এ প্রসারের কারণ হল- তার শিক্ষা স্পষ্ট এবং সত্য। কেননা, ইসলাম একক সত্ত্বা আল্লাহ তায়ালায় দিকে ডাকে যিনি একমাত্র উপাসনা পাবার হকদার।

রাসুল (সাঃ) ছিলেন সন্মান, ন্যায়-পরায়নতা, দয়া-মায়া, সততা ও সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এছাড়া তিনি মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত প্রকার খারাপ গুণাবলী থেকে ছিলেন

পবিত্র এবং অনেক দূরে। তার সংগ্রাম ছিল আখেরাতে প্রতিদান পাওয়ার নিমিত্তে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়। এতদত্তেও তিনি তার সব কথা, কাজ ও আচার- আচরণে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতেন।

(রাসুল (সাঃ) সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য [www.islam-guide.com/muhammad](http://www.islam-guide.com/muhammad) ব্রাউজ করতে পারেন।)



রাসুল (সাঃ) এর মসজিদ, মসজিদে নববী

### ■ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় মুসলমানদের ভূমিকা

ইসলাম মানুষকে তার ব্রেন ও চিন্তা- শক্তিকে কাজে লাগাতে নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের পরিধি ব্যাপকতা লাভের কয়েকবছরের মধ্যেই উন্নত ও সুন্দর সভ্যতা দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়েছে। দিকে দিকে বহু বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও নতুন এবং পুরাতন চিন্তাধারার সমন্বয়ে চিকিৎসা, গণিত, পদার্থ, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, স্থাপত্যবিদ্যা, সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপকতা লাভ করে। পরবর্তীতে মুসলিম শাসনের মাঝামাঝি সময়ে বীজগণিত, আরবী সংখ্যা, এবং গুণ্যতত্ত্ব ( গণিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম) ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়। মুসলমানরা এস্ট্রোল্যাব, কুয়াড্রান্ট ( বৃত্তের পরিধি মাপনী) ও নাবিকদের জন্য চমৎকার ম্যাপ তৈরীর মত অনেক যন্ত্রপাতি তৈরী করেন, যা ব্যবহার করে আজকের ইউরোপ উন্নয়নের মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে।





এস্ট্রোল্যাব (Astrolabe) বিজ্ঞানের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। মুসলমানগণ এটাকে আবিষ্কার করেছিলেন। পাশ্চাত্যে বর্তমান আধুনিক যুগেও এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।



মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানীরা অপারেশনের কাজে মনোযোগ দিয়েছিলেন। চিত্রের মত অনেকগুলো যন্ত্র তারা অপারেশনের জন্য আবিষ্কার করেছিলেন।...

### ■ ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে মুসলমানদের বিশ্বাস

মুসলমানরা হযরত ঈসা (আঃ) কে সন্মান করে তাকে মনের মণিকুঠায় স্থান দিয়ে থাকে। তারা তাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী হিসেবেই মূল্যায়ন করে থাকে। তারা কঠোরভাবে এ কথা বিশ্বাস করে যে, তার জন্ম হয়েছে কুমারী মায়ের গর্ভে। কুরআন শরীফে তার নামে একটি

সুরাও আছে ( সুরা মারইয়াম। কুরআন শরীফে ঈসা ( আঃ) এর জন্মকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ  
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ  
النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي  
وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا  
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47)

অর্থাৎ, আর যখন ফেরেশতাগণ বললেন: হে মারইয়াম! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তার এক কালিমা'র (বাণী) সুসংবাদ দিচ্ছেন যার নাম হল মাসীহ; মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ)। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি হবেন মহা সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি হবেন সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন: হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শই করেনি? আল্লাহ বললেন: এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন: "হও" অমনি তা হয়ে যায়। (সুরা আলে ইমরান : ৪৫- ৪৭)

আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) কে যেভাবে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেভাবেই তারই নির্দেশে ঈসা (আঃ) এর জন্ম হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ (59)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালায় কাছে ঈসা (আঃ) এর দৃষ্টান্ত হল আদম (আঃ) এর মত। তাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে বলেছেন:হও। অতঃপর তা সংগে সংগে হয়ে গেছে। (সুরা আলে ইমরান: ৫৯)

আল্লাহ তায়ালা নবী হিসেবে ঈসা (আঃ) কে অনেক মু'জিজা দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন:

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ  
فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى  
بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শনসহ এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে তাতে ফুৎকার দিই অমনি তা আল্লাহর হুকুমে উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায়। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ত ও কুষ্ঠ রোগীকে। এবং আমি আল্লাহ তায়ালা হুকুমে জীবিত করে দিই মৃতকে। আমি তোমাদেরকে বলে দিই যা তোমরা খেয়ে আস আর যা ঘরে রেখে আস। (সূরা আলে ইমরান: ৪৯)

মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈসা (আঃ) কে শুলে চড়ানো হয়নি। বরং, তার শত্রুদের ইচ্ছা ছিল তাকে শুলে চড়ানোর। আল্লাহ তায়ালা তাকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করে ওখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে তার মত সাদৃশ্য দিয়ে দিয়েছেন। তারা তাকে ঈসা (আঃ) ভেবে শুলে চড়িয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا  
صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَبَّهُ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ  
مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157)

অর্থাৎ, আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মারইয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) কে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল। অথচ, তারা তাকে হত্যাও করেনি আবার শুলেও চড়ায়নি। বরং, তারা ধাধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এ ক্ষেত্রে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে আছে। শুধুমাত্র অনুমান ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করে নি। (সূরা নিসা: ১৫৭)

ঈসা (আঃ) সহ কোন নবী এক আল্লাহর উপর ঈমান ও পূর্ববর্তী নবীদের আনীত দ্বীনের উপর ঈমান আনার মত মৌলিক বিষয়ে পরিবর্তন আনতে প্রেরিত হননি। বরং, সমস্ত নবী ও রাসূল (সাঃ) এসেছিলেন পূর্ববর্তী নবীগণের আনীত বিষয়কে শক্তিশালী করা ও নতুনভাবে তার বিস্তৃতি ঘটানোর জন্য।



ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস)

(ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে <http://www.islam-guide.com/jesus> ব্রাউজ করতে পারেন।)

(টীকা: মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ) এর উপর ইঞ্জিল নাযিল করেছেন। তার কিছু অংশ "New Testament" এ অবশিষ্ট আছে। কিন্তু, তার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানরা বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিল তথা বাইবেলকে বিশ্বাস করে। কেননা, সেটা ঈসা (আঃ) এর উপর যেভাবে নাযিল হয়েছে অবিকল সেভাবে বর্তমান নেই। তাতে অনেকাংশে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়াও কিছু অংশকে উহ্য করা হয়েছে। এটা "বাইবেল (Revised Standard Version) সম্পাদনা কমিটির" ই বক্তব্য। এই কমিটি গঠিত হয়েছিল ৩২ জন (গবেষক) পণ্ডিতের তত্ত্বাবধান ও ৫০ জন খৃষ্টান ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সহযোগিতায়। কমিটি বাইবেলের (Revised Standard Version) ভূমিকায় স্পষ্টভাষায় লিখেছে- "এই বাইবেল অনেক বার পরিবর্তনের শিকার হয়েছে। এর কোন নির্ভুল কপি নেই। ফলে, আমাদের উচিত ঐ সমস্ত কপিকে অনুসরণ করা যা গবেষক পণ্ডিতগণ সঠিকের নিকটবর্তী বলে মনে করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। পরিবর্তন, সংযোজন ও গোপন করার প্রতি ইংগিত দিয়ে পাদটীকা সংযোজন করা হয়েছে" আরও বিস্তারিত জানতে উপরের লিঙ্কে ব্রাউজ করুন।)

## ■ সন্ত্রাস সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

ইসলাম দয়া ও উদারতার ধর্ম তা সন্ত্রাসকে সাপোর্ট করে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা মুমতাহিনা: ৮)

রাসুল (সাঃ) যুদ্ধের ময়দানে নিজ সৈন্যদেরকে নিষেধ করতেন কোন মহিলা বা শিশুকে হত্যা করতে। (মুসলিম শরীফ: ১৭৪৪, বুখারী শরীফ: ৩০১৫) তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিতেন আমানতের খেয়ানত, হত্যায় বাড়াবাড়ি এবং শিশুদেরকে হত্যা না করতে। (মুসলিম শরীফ: ১৭৩১, তিরমীজি: ১৪০৭)

রাসুল (সাঃ) আরও বলেন:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

অর্থাৎ, যে কোন যিম্মিকে (মুসলিম দেশে বসবাসের অনুমতিপ্রাপ্ত অমুসলিম) হত্যা করবে সে বেহেশতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ, তার সুগন্ধি চল্লিশ বছরের সমান দূরত্বের রাস্তা পর্যন্ত পাওয়া যায়। (বুখারী শরীফ: ৩১৬৬, ইবনে মাজাহ: ২৬৮৬)

রাসুল (সাঃ) আগুনে পুড়িয়ে কাউকে শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ: ২৬৭৫)

ইসলাম হত্যাকাণ্ডকে দ্বিতীয় বৃহত্তম অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। (মুসলিম: ৮৮, বুখারী: ৬৮৭১) এমনকি রাসুল (সাঃ) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বিচার হবে আঘাত ও হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে। (মুসলিম শরীফ: ১৬৭৮, বুখারী শরীফ: ৬৫৩৩)

শুধু মানুষ নয় রাসুল (সাঃ) পশুদের সাথেও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে কষ্ট দেয়াকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। রাসুল (সাঃ) বলেন:

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَأِ هِيَ  
أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

অর্থাৎ, একজন মহিলাকে শাস্তি দেয়া হবে শুধুমাত্র একটি বিড়াল ছানাকে বেধে রাখার কারণে। সে তাকে বেধে রাখত তাকে ছেড়েও দিতনা আবার খেতেও দিতনা। এ কারণেই তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সে তাকে আটকিয়ে রাখত তাকে সুযোগ দিত না যেন সে জমিনে বিচরণ করে কীট- পতংগ খেতে পারে। (মুসলিম শরীফ: ২৪২২, বুখারী শরীফ: ২৩৬৫)

তিনি আরও বলেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْرًا فَنَزَلَ فِيهَا  
فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ  
لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبَيْرَ  
فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ  
فَغَفَرَ لَهُ. « قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لِأَجْرًا فَقَالَ  
فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ »

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাটতেছিল। পিপাসা লাগলে সে একটি কুপে নেমে পানি পান করে পিপাসা মেটাল। সেখান থেকে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর হাপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কর্দমাক্ত মাটি চাটছে। লোকটি বললেন: পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল তারও ঠিক একই পরিণতি হয়েছে। সে কুপের ভিতরে নেমে নিজের মোজা ভর্তি করে পানি তুলে এনে কুকুরের সামনে ধরল। কুকুরটি পানি পান করে জীবন ফিরে পেল। লোকটি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। ফলে, আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ! জন্তুকে পানি পান করানো বা তার সাথে ভাল ব্যবহার করায়ও কি সাওয়াব আছে? রাসুল (সাঃ) বললেন: প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীতেই সাওয়াব আছে। (বুখারী ও মুসলিম)...

এ ছাড়াও যখন খাওয়ার জন্য কোন জন্তু জবেহ করা হয় তখন তাকে অপেক্ষাকৃত কম ভয় দেখানো ও কষ্ট দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রাসুল (সাঃ) বলেন:



إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا

ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সব কিছুতেই ইহসান তথা সদয় হতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা করবে তখন সহৃদয়তার সাথে তা করবে। যখন তোমরা জবেহ করবে তখনও ইহসান তথা সহৃদয়তার সাথে জবেহ করবে। আর (তোমাদের কেউ যখন জবেহ করবে) সে যেন তার অস্ত্রকে ভালভাবে ধার দিয়ে নেয় এবং জন্তুকে প্রশান্তি দেয়। (মুসলিম শরীফ:১৯৫৫, তিরমীজি:১৪০৯)

এ বিধানাবলীসহ ইসলামের অন্যান্য বিধানাবলীর আলোকে বলা যায়- যে সমস্ত কাজ নাগরিকদের মনে ভীতির সঞ্চার করে, ঘরবাড়ী- জিনিসপত্র ধ্বংস করে দেয় এবং বোমা মেরে নীরিহ নারী- পুরুষ ও শিশুদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি কাজ ইসলাম ও মুসলমানদের দৃষ্টিতে হারাম ও অবৈধ। ইসলাম শান্তি, কল্যাণ ও উদারতার ধর্ম। বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু মুসলমানের চালানো হামলার সাথে অধিকাংশ মুসলমানেরই কোন সম্পৃক্ততা নেই। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায় তাহলে, সে ইসলামী শরীয়তের উপর কলঙ্ক লেপন করেছে বলে গণ্য হবে।

### ■ ইসলামে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার

ইসলাম একজন ব্যক্তির জন্য বহু অধিকার নিশ্চিত করেছে। তন্মধ্যে কিছু অধিকার নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল-

ইসলামী দেশে ইসলাম প্রতিটি মানুষের জীবন ও সম্পত্তিকে পবিত্র বলে মনে করে। ব্যক্তি হোক মুসলমান বা অমুসলিম। ইসলাম মানুষের মান-সম্মানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য একে অপরকে নিয়ে ঠাট্টা- বিদ্রোপ করা বা গালি দেয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

রাসুল (সাঃ) বলেন:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান একে অপরের নিকট পবিত্র। (বুখারী শরীফ:১৭৩৯)

সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদকে ইসলাম সমর্থন দেয় না। কুরআন কঠোরভাবেই মানুষের মধ্যকার সমতাকে নিশ্চিত করেছে তার বাণীর মাধ্যমে। মহাগ্রন্থ আল- কুরআন বলেছে:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

অর্থাৎ, হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে, সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত:১৩)

সম্মান, শক্তি ও বংশের অহংকার বশতঃ কোন ব্যক্তি বা জাতি কর্তৃক নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, তাদের মধ্যকার পার্থক্য শুধুমাত্র বিশ্বাস ও খোদাভীতির উপর ভিত্তি করেই নির্ণীত হওয়া উচিত।

রাসূল (সাঃ) বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَأَفْضَلُ لِعَرَبِيٍّ  
عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ  
عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ

অর্থাৎ, হে মানবজাতি! তোমাদের রাব্ব তথা পালনকর্তা একজন। তোমাদের আদিপিতা (আদম আ.) একজন। জেনে রাখ! অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আবার আরবের উপর অনারবেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর উপর সাদা কিংবা সাদার উপর কালোরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া। (তাকওয়ার উপর ভিত্তি করেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে) (মুসনাদে আহমদ:২২৯৭৮)

বর্তমানে বিশ্ববাসীর অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বর্ণবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা। উন্নত দেশগুলো চাদে মানুষ প্রেরণ করতে সক্ষম কিন্তু, কোন মানুষকে অপর কোন মানুষকে ঘৃণা করা বা হত্যা করা থেকে ফেরাতে সক্ষম নয়। রাসূল (সাঃ) এর যুগ থেকেই মানবতার মুক্তির সংবিধান ইসলাম বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে কবর দেয়ার জীবন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে প্রায় ২০ লাখ মুসলমান ফরজ হজ্জ্ব আদায় করতে মক্কায় আগমন করেন। তাদের এ মহাসম্মেলন সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বীজ ছড়িয়ে দেয়।

ইসলাম ন্যায়নীতির ধর্ম। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতকে তার মালিকের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দেবার জন্য এবং যখন তোমরা মানুষের মাঝে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়পরায়নতার সাথে বিচার করার জন্য। (সুরা নিসা:৫৮)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

وَأَقْسُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)

অর্থাৎ, আর তোমরা ন্যায়ানুগ পন্থায় বিচার কর এবং ইনসাফ কায়েম কর। আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (সুরা হুজুরাত:৯)

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তার অপছন্দনীয় ব্যক্তির সাথেও ন্যায়বিচার করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কখনও ন্যায়বিচার না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায় বিচার কর। এটাই খোদাভীতির অধিকতর নিকটবর্তী।... (সুরা মায়েদাহ:৮)

রাসুল (সাঃ) অন্যের উপর জুলুম নির্যাতন ও তার সাথে খারাপ আচরণ থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, তোমরা জুলুম (অবিচার) করা থেকে বেচে থাক। কেননা, এই জুলুমই কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (মুসনাদে আহমদ: ৫৭৯৮, বুখারী শরীফ: ২৪৪৭)

আর যারা দুনিয়ায় তাদের অধিকার নিতে পারে নাই (যে অধিকার তাদের প্রাপ্য ছিল) তারা সে অধিকার পরকালে কিয়ামতের দিন প্রাপ্ত হবে। রাসুল (সাঃ) বলেন:

لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, প্রত্যেক হকদারের হক কিয়ামতের দিন তার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে। (মুসলিম শরীফ: ২৫৮২, মুসনাদে আহমদ: ৭১৬৩)

## ■ ইসলামে নারীর অবস্থান কোথায়?

ইসলাম বিবাহিতা বা অবিবাহিতা সমস্ত নারীকেই তার পূর্ণ ন্যায্য অধিকার ভোগ করার অধিকারীণী বলে মনে করে। কোন সম্পদে বৈধ পছন্ডায় মালিকানা গ্রহণ করা ও মালিকানাধীন সম্পদ (স্বামী, পিতা বা অন্য কারো কর্তৃক বাধা দান বৈধ নয়) বিনা বাধায় ব্যবহার করার অধিকার তার আছে। অধিকার আছে ক্রয়- বিক্রয় করার। কাউকে হাদিয়া (উপঢৌকন) ও দান করার। এক কথায় তার সম্পদ যেখানে খুশি সেখানে ব্যয় করা (বৈধ পছন্ডায়) ও যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তা ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম। স্বামী তার স্ত্রীকে যে মোহর প্রদান করে তাতেও তার নিজস্ব এখতেয়ার রয়েছে। (বিবাহিতা) মহিলা নিজের পরিচয়ের জন্য স্বামীর নাম ব্যবহার না করে পরিবারের নাম ব্যবহার করতে পারে। ইসলাম পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করার। রাসুল (সাঃ) বলেছেন:



أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

অর্থাৎ, ওই ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার যার স্বভাব- চরিত্র সুন্দর। এবং তোমাদের মধ্যকার যারা নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম তারাই উত্তম ব্যক্তি। (মুসনাদে আহমদ, তিরমীজি)

ইসলামে মায়েরা সুউচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন রয়েছে। ইসলাম তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। এক ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার সদ্যবহার পাওয়ার সর্বোত্তম হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন: তারপর কে? রাসুল (সাঃ) বললেন: তোমার মা। সাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন: তারপর কে? রাসুল (সাঃ) জবাব দিলেন: তোমার মা। সাহাবী চতুর্থবার প্রশ্ন করলেন: তারপর কে? রাসুল (সাঃ) এবার জবাবে বললেন: তোমার পিতা। (মুসলিম শরীফ:২৫৪৮, বুখারী শরীফ:৫৯৭১)

(ইসলামে মহিলাদের অবস্থান সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে [www.islam-guide.com/women](http://www.islam-guide.com/women) ব্রাউজ করতে পারেন।)

## ■ ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা

মানবসমাজে পরিবার ব্যবস্থা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক স্থাপনা যা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তবে, ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থা স্বামী-স্ত্রী, শিশু ও নিকটজনদের অধিকারকে পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রেখে অত্যন্ত চমৎকার ও যথাযথভাবে নিশ্চিত করছে। চমৎকার পারিবারিক বন্ধন ভালোবাসা ও মহানুভবতার সৃষ্টি করে। যা শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যমে পরিবারে ভারসাম্য বজায় রাখে। এ ব্যবস্থাকে পরিবারের সদস্যদের আত্মিক সমৃদ্ধির উপাদান বলে গণ্য করা হয়। সমাজে চমৎকার শৃংখলার সাথে যৌথপরিবার পরিচালিত হয় এবং শিশুরা সেবাযত্নের সাথে বেড়ে ওঠে।

## ■ বৃদ্ধদের সাথে মুসলমানদের ব্যবহার:

মুসলিম বিশ্বে "বৃদ্ধাশ্রম" খুজে পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। কারণ, ইসলামে পিতামাতার সাথে চমৎকার সম্পর্ক রাখার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাদের জীবনের কঠিন সময়ে এটাকে সম্মান ও বরকত লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আমরা আমাদের পিতামাতার জন্য শুধু দোয়া করব এতেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে দয়া-মায়া ও সহৃদয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে তাদের সাথে সদাচরণ করে যাওয়া; আমাদের শিশুকালে যখন আমাদের কোন শক্তি ছিল না, কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না, তখন তারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে আমাদের কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের এ অস্বাধারণ ভূমিকা ও ত্যাগ-তিতীক্ষার কথা স্মরণ রাখা উচিত। এ জন্যই আমরা মায়ের মর্যাদাকে উচ্চাসনে আসীন দেখতে পাই। কারো পিতামাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন তাদের সাথে উদারতা, সহানুভূতি ও নিজের সুখ দুঃখকে বাজী রেখে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। ইসলামে আল্লাহ তায়ালা ইবাদাতের পরেই পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পিতামাতার কঠিন সময় বার্ধক্য বয়সে তারা অসন্তুষ্ট হন এমন যে কোন কথাবার্তা বলা মুসলমানদের উচিত নয়। কারণ, যখন তারা অকর্মণ্য হয়ে পড়েন তখন তাদের কোন গোনাহ নেই; তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا

## قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের একজন বা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে "উহ" শব্দটিও বলো না, তাদেরকে ধমক দিওনা এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারমূলক কথা বল। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা অবনমিত হও এবং বল হে আমার পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমনি তারা আমাকে শৈশবে লালনপালন করেছেন। (সূরা বানী ইসরাইল:২৩- ২৪)

### ■ ইসলামের পাঁচটি রুকন

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ মুসলিম জীবনের মৌলিক কাঠামো সদৃশ। সেগুলো হল-

১. لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ বা " আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল" এ কথার সাক্ষ্য দেয়া।
২. নামাজ কায়েম করা।
৩. যাকাত প্রদান করা।
৪. রমজানের রোজা রাখা।
- ৫.সামর্থবান ব্যক্তির জন্য হজ্জ্ব করা।

### ১. لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ এর সাক্ষ্য দেয়া:

বিশ্বাসের সাথে (لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) উচ্চারণ করবে।প্রথমমাংশের অর্থ হল- " আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া উপাসনা পাওয়ার অধিকারী কেউ নেই। তার কোন অংশীদার বা সন্তান নেই। এই বাক্যটি ব্যাপকার্থবোধক। পূর্ণাঙ্গ ঈমান তথা বিশ্বাসের সাথে বাক্যটি উচ্চারণ করতে হবে। এর দ্বারা ব্যক্তি মুসলমানে রূপান্তরিত হয় (যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে)। এ সাক্ষ্য ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান স্তম্ভ।

## ২. নামাজ কায়েম করা:

একজন মুসলিম দিনে পাঁচবার নামাজ আদায় করে। প্রতিটি ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতে কয়েক মিনিটের বেশী সময় লাগে না। নামাজ বান্দা ও আল্লাহ তায়ালা মধ্যকার যোগাযোগের মাধ্যম। নামাজের সময় বান্দা ও আল্লাহ তায়ালা মাঝে কোন মাধ্যম অবশিষ্ট থাকে না। নামাজী ব্যক্তি নামাজের মধ্যে আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করে থাকে। সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। রাসূল (সাঃ) বেলাল (রাঃ) কে নামাজ সম্বন্ধে বলেছিলেন:

أَرْحَنَّا بِهَا يَا بَلَالُ

অর্থাৎ, হে বেলাল (রাঃ)! নামাজ দ্বারা আমাদেরকে প্রশান্ত করে দাও। (আবু দাউদ: ৪৯৮৫, মুসনাদে আহমদ: ২২৫৭৮)

বেলাল (রাঃ) ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি নামাজের আযান দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ফজর, জোহর, আছর, মাগরিব ও ইশার নামাজ যথাক্রমে ভোর, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রের প্রথম প্রহরে আদায় করা হয়। নামাজ খোলা মাঠ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সব স্থানেই আদায় করা যায়।

(ইসলামে নামাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে <http://www.islam-guide.com/prayer> বাউজ করতে পারেন। এ ছাড়া এম.এ.কে. সাকিবের "এ গাইড টু প্রেয়ার ইন ইসলাম" বইটি পড়তে পারেন। উপরের ওয়েবসাইট থেকে এ বইটা সংগ্রহেও রাখতে পারেন।)

## ৩. যাকাত আদায় করা (অভাবীদের সাহায্যার্থে):

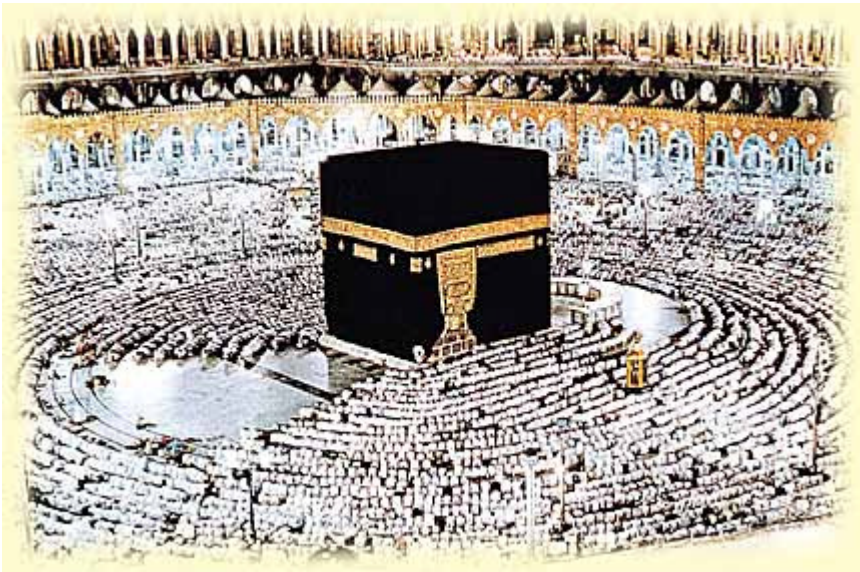
সবকিছুর মূল মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা। মানুষের নিকট যে সম্পদ রয়েছে তা তার কাছে আমানত। আরবী "যাকাত" শব্দটি অর্থ একইসঙ্গে পবিত্র হওয়া ও বৃদ্ধি পাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাকাত আদায়ের (পারিভাষিক) অর্থ হল- "বিভিন্ন স্তরের অভাবীদের মাঝে নিজ সম্পদের শতকরা নির্দিষ্ট পরিমাণ (২.৫%) বন্টন করে দেয়া"। স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ ক্যাশের মূল্য ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের সমপরিমাণ হলেই উক্ত পরিমাণ সম্পদ অভাবীদের মাঝে বন্টন করতে হবে। এর জন্য ১ চন্দ্র বছর (৩৫৪ দিন) হওয়া শর্ত। প্রদেয় পরিমাণ হল ২.৫%। আমরা আমাদের সম্পদের পবিত্রতার স্বার্থে সম্পদের কিছু অংশ অভাবীদের জন্য ছেড়ে দিয়ে থাকি। ফসল কাটার সময় যেমনটি ঘটে থাকে। এটা নতুনভাবে ফসল উৎপাদন করতে সাহায্য করে। এর ফলে ব্যক্তি বেশী বেশী সাদকাহ ও সৎকর্মের সুযোগ পায়।

## ৪. রমজানের রোজা:

মুসলমানগণ রমজান মাসে ("রমজান" হিজরী সালের নবম মাসের নাম) সুবহে সাদিক থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে দূরে থেকে রোজা পালন করেন। এ ছাড়া রোজা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী; একে আত্মিক পবিত্রতার একটি কারিকুলাম হিসেবে দেখা হয়। সামান্য সময়ের জন্য হলেও দুনিয়াবী ভোগ্য জিনিস থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে অভাবী অনাহারীদের অবস্থা তারা বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারেন। এভাবে তিনি আত্মিক জীবনে প্রবেশ করতে পারেন।

## ৫. মক্কায় হজ্জু করা:

সম্পদ ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সামর্থবান ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার হজ্জু করা ফরজ। প্রতি বছর পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে প্রায় ২ মিলিয়ন তথা ২০ লক্ষ লোক হজ্জু করতে মক্কায় আসেন। এছাড়াও মক্কা শরীফ সর্বদা যিয়ারতকারীদের দ্বারা জনাকীর্ণ থাকে। আরবী জিলহজ্জু মাসে হজ্জু আদায় করা হয়। হাজীরা অত্যন্ত সাধারণ পোশাক পরিধান করে থাকেন। তা কৃষ্টি-কালচার ও মানুষের মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদ সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে সবাই আল্লাহ তায়ালার সামনে সমানভাবে দন্ডায়মান হয়। কা'বা ঘরকে সাতবার তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা, সাতবার সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সায়ী (দৌড়ানো) করাও হজ্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কাজ। যেমনটি করেছিলেন হযরত ইসমাইল (আঃ) এর সম্মানিতা মাতা হাজের (আঃ) সন্তানের জন্য পানি তালাশের উদ্দেশ্যে। এরপর হাজীগন একত্রে আরাফাতের ময়দানে (মক্কা থেকে ১৫ মাইল দূরে) সমবেত হন। সেখানে তারা আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রয়োজন পূরণের দোয়া করে তার কাছে ক্ষমা চান। আরাফাতের এ দিনটি আমাদেরকে কিয়ামতের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হজ্জের শেষে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়। এই ঈদ ও রমজান পরবর্তী ঈদুল ফিতর ইসলামী পঞ্জিকার বাৎসরিক ঈদ।





এটি মসজিদুল হারামে হাজীদের নামাজ আদায়ের দৃশ্য। এই মসজিদেই কা' বা ঘর অবস্থিত। মুসলমানগণ সেদিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেন। কা' বা মুসলমানদের ইবাদাতের কিবলাহ। আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম ও ইসমাইল (আঃ) কে এই ঘর তৈরী করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

(ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে <http://www.islam-guide.com/pillars> ব্রাউজ করতে পারেন।)

ইসলাম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে কিংবা ইংরেজী ভাষায় এই বইয়ের প্রিন্ট কপি পেতে <http://www.islam-guide.com> ভিজিট করতে পারেন।

এই বই সম্বন্ধে পরামর্শ ও মন্তব্য জানাতে গ্রন্থকার "আই. এ. ইবরাহীম" এর সাথে যোগাযোগ করুন।

ই. মেইল: [ib@i-g.org](mailto:ib@i-g.org)  
টেলিফোন: ০০৯৬৬১৪৫৪১০৬৫  
ফ্যাক্স: ০০৯৬৬১৪৫৩৬৮৪২  
পোস্ট বক্স নং: ২১৬৭৯  
রিয়াদ- ১১৪৫৭  
সউদী আরব

ইসলাম সম্বন্ধে আরও বেশী জানতে হলে পড়ুন-

- The True Religion, by Bilal Philips
- The Quran and Modern Science, by Dr. Maurice Bucaille, edited by Dr. A. A. B. Philips.
- Towards Understanding Islam, by Abul A'la al-Mawdudi.
- Life after Death (pamphlet), by World Assembly of Muslim Youth.
- Interpretation of the Meanings of The Noble Quran in the English Language, by Dr. Muhammad Al-Hilali and Dr. Muhammad Khan.
- The Muslim's Belief, by Muhammad al-Uthaimin, translated by Dr. Maneh al-Johani.

উক্ত গ্রন্থগুলো নিচের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।  
<http://www.islam-guide.com>

## সহায়ক গ্রন্থাবলী

- Ahrens, C. Donald. 1988. *Meteorology Today*. 3rd ed. St. Paul: West Publishing Company
- Anderson, Ralph K.; and others. 1978. *The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting*. Geneva: Secretariat of the World Meteorological Organization.
- Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; and Hans A. Panofsky. 1981. *The Atmosphere*. 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Barker, Kenneth; and others. 1985. *The NIV Study Bible, New International Version*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House.
- Bodin, Svante. 1978. *Weather and Climate*. Poole, Dorset: Blandford Press Ltd.
- Cailleux, Andre'. 1968. *Anatomy of the Earth*. London: World University Library.
- Couper, Heather; and Nigel Henbest. 1995. *The Space Atlas*. London: Dorling Kindersley Limited.
- Davis, Richard A., Jr. 1972. *Principles of Oceanography*. Don Mills, Ontario: Addison-Wesley Publishing Company.
- Douglas, J. D.; and Merrill C. Tenney. 1989. *NIV Compact Dictionary of the Bible*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House.
- Elder, Danny; and John Pernetta. 1991. *Oceans*. London: Mitchell Beazley Publishers.
- Famighetti, Robert. 1996. *The World Almanac and Book of Facts 1996*. Mahwah, New Jersey: World Almanac Books.
- Gross, M. Grant. 1993. *Oceanography, a View of Earth*. 6th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
- Hickman, Cleveland P.; and others. 1979. *Integrated Principles of Zoology*. 6th ed. St. Louis: The C. V. Mosby Company.
- Al-Hilali, Muhammad T.; and Muhammad M. Khan. 1994. *Interpretation of the Meanings of The Noble Quran in the English Language*. 4th revised ed. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam.
- *The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (Revised Standard Version)*. 1971. New York: William Collins Sons & Co., Ltd.
- Ibn Hesham, Abdul-Malek. *Al-Serah Al-Nabaweyyah*. Beirut: Dar El-Marefah.

- The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia, Washington, DC. 1989. Understanding Islam and the Muslims. Washington, DC: The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia.
- Kuenen, H. 1960. Marine Geology. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Leeson, C. R.; and T. S. Leeson. 1981. Histology. 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company.
- Ludlam, F. H. 1980. Clouds and Storms. London: The Pennsylvania State University Press.
- Makky, Ahmad A.; and others. 1993. Ee'jaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa' al-Riyah, al-Sohob, al-Matar. Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.
- Miller, Albert; and Jack C. Thompson. 1975. Elements of Meteorology. 2nd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Moore, Keith L.; E. Marshall Johnson; T. V. N. Persaud; Gerald C. Goeringer; Abdul-Majeed A. Zindani; and Mustafa A. Ahmed. 1992. Human Development as Described in the Quran and Sunnah. Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.
- Moore, Keith L.; A. A. Zindani; and others. 1987. Al-E'jaz al-Elmy fee al-Naseyah (The scientific Miracles in the Front of the Head). Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.
- Moore, Keith L. 1983. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, With Islamic Additions. 3rd ed. Jeddah: Dar Al-Qiblah.
- Moore, Keith L.; and T. V. N. Persaud. 1993. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. 5th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company.
- El-Naggar, Z. R. 1991. The Geological Concept of Mountains in the Quran. 1st ed. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Neufeldt, V. 1994. Webster's New World Dictionary. Third College Edition. New York: Prentice Hall.
- The New Encyclopaedia Britannica. 1981. 15th ed. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Noback, Charles R.; N. L. Strominger; and R. J. Demarest. 1991. The Human Nervous System, Introduction and Review. 4th ed. Philadelphia: Lea & Febiger.

- Ostrogorsky, George. 1969. History of the Byzantine State. Translated from the German by Joan Hussey. Revised ed. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Press, Frank; and Raymond Siever. 1982. Earth. 3rd ed. San Francisco: W. H. Freeman and Company.
- Ross, W. D.; and others. 1963. The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica. vol. 3. London: Oxford University Press.
- Scorer, Richard; and Harry Wexler. 1963. A Colour Guide to Clouds. Robert Maxwell.
- Seeds, Michael A. 1981. Horizons, Exploring the Universe. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate. 1996. Essentials of Anatomy & Physiology. 2nd ed. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc.
- Sykes, Percy. 1963. History of Persia. 3rd ed. London: Macmillan & CO Ltd.
- Tarbuck, Edward J.; and Frederick K. Lutgens. 1982. Earth Science. 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Thurman, Harold V. 1988. Introductory Oceanography. 5th ed. Columbus: Merrill Publishing Company.
- Weinberg, Steven. 1984. The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe. 5th printing. New York: Bantam Books.
- Al-Zarkashy, Badr Al-Deen. 1990. Al-Borhan fee Oloom Al-Quran. 1st ed. Beirut: Dar El-Marefah.
- Zindani, A. A. This is the Truth (video tape). Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.

❖ হাদীস নম্বরের ক্ষেত্রে যে সমস্ত গ্রন্থ সহায়ক ছিল: -

- Saheeh Muslim: according to the numbering of Muhammad F. Abdul-Baqy.
- Saheeh Al-Bukhari: according to the numbering of Fath Al-Bari.
- Al-Tirmizi: according to the numbering of Ahmad Shaker.
- Mosnad Ahmad: according to the numbering of Dar Ehya' Al-Torath Al-Araby, Beirut.
- Mowatta' Malek: according to the numbering of Mowatta' Malek.

- Abu-Dawood: according to the numbering of Muhammad Muhyi Al-Deen Abdul-Hameed.
- Ibn Majah: according to the numbering of Muhammad F. Abdul-Baqy.
- Al-Daremev: according to the numbering of Khalid Al-Saba Al-Alamy and Fawwaz Ahmad Zamarly.

تمت بحمد الله